আলজেরিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ভস্মীভূত ঐতিহাসিক নতরদাম গীর্জা (প্যারিস)

মার্চ, ২০১৯ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ একাদশ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

নির্বাচন কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

মহাকরণে বিক্ষোভ

সারা দেশের সাথে এই রাজ্যেও সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সাত দফার এই নির্বাচনে প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১১ এপ্রিল, রাজ্যের দুটি জেলা কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে। নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা বা ভোটারলিস্ট সংশোধন ও সংযোজনের কাজ থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রশ্নে নির্বাচন কর্মী হিসাবে মূলত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচন কর্মীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার ওপর দাঁড়িয়ে গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, যদি না প্রশাসনের অভ্যন্তরে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ থাকে এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ২০১১ সাল উত্তর পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন কর্মীদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হল, প্রশাসনের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক চাপ মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ কার্যত নেই। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও সর্বদা আকাঙ্খিত স্তরে থাকে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি ও হুমকির মধ্যে থেকেই তাঁদের কাজ করতে হয়। ভয়-ভীতি ও হুমকির মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় নির্বাচন ও গণনার দিনগুলিতে। কার্যত সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কর্মীদের কাজ করতে হয়। এমনই ভয়-ভীতির পরিবেশ উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে যখন নির্বাচন কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালনে রত একজন শিক্ষককে (রাজকুমার রায়) হত্যা পর্যন্ত করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে

স্বভাবতই এবারে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

রাজ্য কাউন্সিলের সপ্তম সভা

আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে

বিজয় শংকর সিংহ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

বিগত ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ সারা দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার ঐতিহাসিক ধর্মঘট ২০ কোটি শ্রমিক কর্মচারী শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণীর বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুমকী পরোয়ানা সত্ত্বেও সংগঠনের নেতৃত্বে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধারাবাহিকভাবে অ্যাজিটেশন ধর্মী কর্মসূচী ও ব্যাপক প্রচারের মধ্যে দিয়ে ধর্মঘটীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগঠনের অভ্যন্তরে এই সাফল্যকে সংহত করেই আরও সংঘবদ্ধভাবে আসন্ন বৃহত্তর সংগ্রামে দেশের ঐক্য ও সংহতি, গণতন্ত্র রক্ষা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে চরম উগ্র দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন শক্তিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে এবং রাজ্যে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে ও চরম আর্থিক প্রতারণার প্রতিবাদে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামীদিনে আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তম কাউন্সিল সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ শুরুতেই উপরোক্ত আহ্বান জানান।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিলের সপ্তম সভা বিগত ৩০-৩১ মার্চ ২০১৯, অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতিত্রয় সুনির্মল রায়, গীতা দে ও প্রশান্ত সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। সভার শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কাউন্সিল সভার একাংশ

নির্বাচন কর্মীদের সুরক্ষা চেয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/১৮/১৯ তারিখ ঃ ০১/০৪/১৯

মাননীয়
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ নির্বাচনী কাজে কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও ভোট দানের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ।

মহাশয়,

আপনার হয়তো স্মরণে আছে আসন্ন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে পরিচালনা এবং নিয়োজিত নির্বাচন কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা ১৫ মার্চ ২০১৯ একটি চিঠিতে (পত্র নং ১৪/১৯) কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আপনার কাছে রেখেছিলাম, যার প্রাপ্তি স্বীকার হয়েছে ১৮ মার্চ ২০১৯। উক্তপত্রে এই নির্বাচনে পূর্ণ সময়ের নিয়মিত কর্মচারীদেরই কেবল নির্বাচনীকাজে ব্যবহারের জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম। একই সঙ্গে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহ নির্বাচন কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে বিশদে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। উপরোক্ত বিষয়গুলিতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ পরিলক্ষিত হলেও আমাদের মনে হয়েছে এ ব্যাপারে কাঙ্খিত অগ্রগতি ঘটেনি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা তাই পুনরায় কিছু জরুরী বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, বহু জেলাতেই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে যুক্ত করা হয়েছে, যা বিধিসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, বেশকিছু জেলায় চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদেরও নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নিয়মানুগ নয়। তৃতীয়ত, নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মীরা এখনও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তার সুনিশ্চয়তার অভাব বোধ করছেন।

এই সময় সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল নির্বাচনী প্রশিক্ষণের সময় নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মীদের হাতে ১২ নং এবং ১২-এ নং ফর্ম ভরে, দুটিই জমা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে নির্বাচনী কর্মীদের নিজস্ব সুবিধা দিতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অধিকারিকরা অস্বীকৃত হচ্ছেন। এই সকল ঘটনাকে নির্বাচনীকাজে যুক্ত কর্মীরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার প্রয়াস বলে মনে করছেন।

একই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে সমগ্র ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও খুঁতহীন ভাবে পরিচালনার জন্য প্রদত্ত প্রশিক্ষণ নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও অপ্রতুল বলে কর্মীরা মনে করছেন। তদুপরি প্রশিক্ষণে ভিভিপ্যাট-এর মেশিন (একাধিক) ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে, যার ব্যবহারিক দিক ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। তাই এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও নজরদারীর অনুরোধ জানাই।

এমত পরিস্থিতিতে সমগ্র বিষয়গুলির ওপর আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং গণতান্ত্রিকভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়গুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে বিশদে আলোচনার জন্য আমরা পুনরায় আপনাকে দ্রুত একটি দিন ও সময় ধার্য করে আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ,
ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য কর্মচারীদের প্রতি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

গত পাঁচ বছর আরএসএস-বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার অবনমন ঘটেছে। ভয়ংকর আক্রমণ নেমে এসেছে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর। শুধু তাই নয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র আমাদের দেশের গর্ব ছিল, তা আজ বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও স্বৈরাচারী প্রবণতার দ্বারা আক্রান্ত। ত্রিপুরাতে বিজেপি সরকারের শাসনকালে নয়া পেনশন ব্যবস্থা চালু সহ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। সেই রাজ্যের কর্মচারীরাও আতঙ্কিত। এছাড়া আমাদের রাজ্যে চরম আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অতীতের ন্যায় অভিজ্ঞতার নিরিখে আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে কর্মচারীদেরকে সংগ্রামী দায়িত্ব প্রতিপালন করার আহ্বান রাখছি।

বিজয় শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

কমরেড অশোক রায়ের জীবনাবসান

বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই অকস্মাৎ চির বিদায় নিলেন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদায়ী ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী, সকলের প্রিয় ও সদাহাসিমুখ কমরেড অশোক রায়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কর্মচারী আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক রায় কিডনি সংক্রান্ত রোগে 'ডায়ালিসিস' চিকিৎসার মাঝখানেই গত ২৫ মার্চ ২০১৯ অফিসে আসার পথে বাসের মধ্যে বসা অবস্থাতেই হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে চিরনিদ্রায় চলে গিয়েছেন। চিকিৎসার কোন সুযোগই পাওয়া যায়নি।

সম্পূর্ণ নির্বিরোধী, আত্মপ্রচার বিমুখ কিন্তু নীতির প্রশ্নে দৃঢ়, মতাদর্শগত ঋজুতায় টইটম্বুর এবং সেকারণে শাসকশ্রেণী ও তাদের অনুচরদের প্রতি দ্বিধাহীন ঘৃণা প্রকাশে সামনের সারির সাহসী সৈনিক, অথচ কর্মচারীবন্ধুদের মাঝে সর্বদা স্মিতহাস্যময় আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্কে জনপ্রিয়তা—এমন বহুমুখী গুণাবলী সমৃদ্ধ যে সাংগঠনিক জীবন তৃণমূল স্তর

থেকে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছিল, মাত্র ৫৭ বছর বয়সে কমরেড অশোক রায়ের জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ায় সমিতির সর্বস্তরে তো বটেই, সমগ্র কর্মচারী আন্দোলনের পরিসরেই গভীর মর্মবেদনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে বর্তমানে যখন শ্রেণীযুদ্ধ তথা তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের আবহ, সেই সময়ে কমরেড অশোক রায়ের মতো একজন কৌশলী লেখক, প্রচারক ও সংগঠকের অকস্মাৎ প্রয়াণ এক শূন্যতা তৈরি করলো।

মাত্র সাতান্ন বছরে ঝরে যাওয়া জীবনের শুরু বীরভূম জেলার মল্লারপুর সংলগ্ন বাহিনা গ্রামে ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

বিরোধিতার নয়া ব্যাকরণ

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা (অবশ্যই যাঁরা 'স্পেড'কে 'স্পেড' বলার সাহস রাখেন তাঁরা) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করছেন। আমাদের পত্রিকার এই সংখ্যাতেই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ প্রভাত পট্টনায়েকের এখনই একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখার অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ডঃ পট্টনায়েক বা তাঁর মতই যাঁরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করছেন, তার প্রায় সবগুলিই সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতের বাইরে, শুধুমাত্র আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতেও এবারের লোকসভা নির্বাচনের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট রয়েছে, যা আলোচনায় আনা প্রয়োজন। কারণ যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর (রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার-পরিজনসহ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের আকাঙ্খিত 'ডিসকোর্স' হওয়া উচিত অভিজ্ঞতা। কারণ অভিজ্ঞতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ 'শিক্ষক'। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এবারের নির্বাচনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হলো (যার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত), অভিজ্ঞতা নির্ভর 'ডিসকোর্সটি'-র উপর সুকৌশলে নির্মিত একটি ভিন্ন ডিসকোর্সকে 'সুপার-ইম্পোজ' করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিসকোর্সটি হলো, রাজ্যের শাসকদলের বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রের শাসকদলকে এই রাজ্যের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা। অভিজ্ঞতা নির্ভর ডিসকোর্সের ওপর, এই ডিসকোর্সটিকে প্রবল প্রচারের সাহায্যে 'সুপার-ইম্পোজ' করা হচ্ছে, কারণ সাধারণ মানুষের কাছে যদি এই আবেদন করা হয় যে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনারা রাজ্যের শাসকদলের পরিবর্তে, কেন্দ্রের শাসকদলকে বেছে নিন, তাহলে তো কখনোই সফল হবে না। কারণ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার যে অভিজ্ঞতা, তা তো রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় শাসকদলের ক্রিয়া কলাপের সমন্বিত ফল। গত পাঁচ বছরে পেট্রোপণ্যসহ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, নোটবন্দী, জিএসটি, কৃষি সঙ্কট, শিল্পোৎপাদনের হার হ্রাস পাওয়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়া প্রভৃতি প্রতিকূল উপাদানগুলি তো সারা দেশের সাথে, এ রাজ্যের মানুষের জীবনে নেতিবাচক ছাপ ফেলেছে। তাই অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়ে দিলে কখনোই কেন্দ্রের শাসকদল স্বাভাবিক বিকল্প হবে না।

আবার বিপরীতটাও একইভাবে সত্য। সরকার পরিচালনার প্রতিটি বিভাগে কেন্দ্রীয় শাসকদলের ব্যর্থতা এতটাই প্রকট, যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত হতে দিলে, বিকল্পের খোঁজ হবে তার স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু সেই বিকল্পের বৃত্তে কোনোভাবেই রাজ্যের শাসকদলের, অভিজ্ঞতার নিরিখে, স্থান পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ সরকার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় দলটির মতোই রাজ্যের শাসকদলটিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কৃষি সঙ্কট, শিল্প সঙ্কট, বেকারির সমস্যা প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উভ সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান, একেবারে যমজ সন্তানের মতোই। তাই অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করলে উভয় দল একে অপরের প্রতিবিম্ব হতে পারে, বিকল্প কখনোই নয়। কারণ বিকল্প মানে তো ভিন্ন ধর্মী, ভিন্ন নীতি, ভিন্ন আদর্শ (এটার কোনো বালাই অবশ্য রাজ্যের শাসক দলটির নেই।), ভিন্ন কর্মসূচী ইত্যাদি। স্বভাবতই বিকল্প না হলেও 'বিকল্প' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রচারের 'সুপার-ইম্পোজিশন'।

এ রাজ্যে এ-ওর বিকল্প, ও-এর বিকল্প—এই গল্প ফাঁদতে গিয়ে একটা ব্যাপারে প্রচার মাধ্যম কিন্তু সতর্ক। প্রচার মাধ্যমের এই সতর্কতা কিন্তু অভিজ্ঞতা নির্ভর। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য যারা কার্যত প্রচারের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তারা নিজেরাই প্রচার-কৌশল ঠিক করছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাটা তারা গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা থেকে। ত্রিপুরায় সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত, বামপন্থীদের বিকল্প হিসেবে এ রাজ্যের শাসক দলটিকে তুলে ধরা হতো। বার বার প্রচার করা হতো, কিভাবে ত্রিপুরায় বামপন্থীদের চিরায়ত বিরোধী গোটা কংগ্রেস দলটাই সাইন বোর্ড পাল্টে এ রাজ্যের শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসে পরিণত হয়েছিল। ঐ দলটির সুপ্রিমো তখন বাংলা থেকে ত্রিপুরাতেও সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। দু-চারবার গেছিলেনও সে রাজ্যে বক্তৃতা করতে। সেই সময় তাঁর বিশ্বস্ততম সহযোগীটিকে (এখন যিনি শিবির পাল্টে কেন্দ্রীয় শাসকদলে ভিড়ছেন) ত্রিপুরায় বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে পাঠিয়েওছিলেন, যাঁর সেখানে দায়িত্ব ছিল কংগ্রেস দলকে ভেঙে ভেঙে (খুব বেশি কসরৎ করতে হয়নি) নিজেদের দিকে নিয়ে আসা। ত্রিপুরার বুকে যখন ঘুঁটি সাজানোর কাজ যখন চলছে, তখন হঠাৎই দেখা গেল, কেন্দ্রের শাসক দলটি ঐ ছোট্ট রাজ্যটিতেও ঢোকার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে। তাদের এই উদ্যোগের একটা আদর্শগত কারণ তো ছিল। কারণ ত্রিপুরা আকারে ছোট্ট রাজ্য হলেও, বামপন্থী আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। আবার কেন্দ্রের শাসক দলটি যে মতাদর্শের অনুসারি সেই চরম দক্ষিণপন্থী (ফ্যাসিস্টধর্মী) হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের প্রধান শত্রু বামপন্থী মতাদর্শ (দ্রষ্টব্য ঃ গোলওয়ালকারের 'বাঞ্চ অফ থট্‌স্')। তাই বামপন্থাকে আক্রমণ করার একটা আদর্শগত লক্ষ্য তো ছিলই (যেমন শুরু হয়েছে কেরালাতেও)। পাশাপাশি দুটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক কারণও ছিল। প্রথম সম্ভাব্য কারণটি হলো ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা এবং দ্বিতীয় কারণটি হলো, 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত'-র স্লোগানকে কার্যকরী করা। সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ও অনেকগুলি উপনির্বাচনে জোর ধাক্কা খাওয়ার পর আর অবশ্য 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত'-এর কথা শোনা যাচ্ছে না। এমনকি আমাদের বচন-বাগীশ প্রধানমন্ত্রীও আর বলছেন না।

সে যাই হোক, পুনরায় ত্রিপুরার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, কেন্দ্রের শাসকদলটি যখনই ত্রিপুরায় ঢুকতে সমর্থ হল, মাত্র কিছুদিন আগেই কংগ্রেস দলের জার্সি ছেড়ে যারা আমাদের রাজ্যের শাসক দলের জার্সি পরে হম্বি-তম্বি করছিলেন, তারাই রাতারাতি ভোল পাল্টে কেন্দ্রের শাসকদলের জার্সি পরে নিলেন। অর্থাৎ যে দলের নেতা-নেত্রীরা (এখানে অবশ্য নেতাদের ফেউ-এর ভূমিকা ছাড়া কোনো স্বাধীনতা নেই) কিছুদিন আগেও গলার শির ফুলিয়ে বলছিলেন, বাংলার পরে এবার ত্রিপুরা দখল হবে, এখন ত্রিপুরায় সেই দলটারই কোনো অস্তিত্ব নেই। গোটা দলটাই 'রং দে তু মোহে গেরুয়া' বলে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছে। অনেকে আবার নতুন ক্যাম্পে গিয়ে মন্ত্রী, মায় নেতা পর্যন্ত হয়ে গেছেন। এ রাজ্যের শাসক দলটিও এখন ত্রিপুরা রাজ্য দখলের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। এখন কোনো সভা, সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলনে ভুলেও তাঁরা ত্রিপুরার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না।

ত্রিপুরার এই ভোজবাজির খেল থেকেই শিক্ষা নিয়েছে প্রচার মাধ্যম। তারা বুঝেই শুধু এই দল ঐ দলের বিকল্প বলে প্রচারের দুন্দুভি বাজালে, এবং সেই প্রচারের ফলে হাওয়া যদি ঘুরতে থাকে, তাহলে ত্রিপুরার ঘটনার পুনরাবৃত্তি এ রাজ্যেও ঘটতে পারে। হয়তো দেখা যাবে গোটা দলটাই গেরুয়াধারী হয়ে গেল। তাতে তো লাভ বিশেষ হবে না। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক মেরুকরণের খুব বেশি হেরফের হবে না। একদিকে বামেরাই থেকে যাবে, অপরদিকে প্রথমে সবুজ, তারপর সবুজায়িত লুম্পেন গোষ্ঠী এবং তারপর গেরুয়া (ঠিক যেমনটা ঘটেছে ত্রিপুরায়)। এও এক পরিবর্তন তো বটেই। কিন্তু কর্পোরেট প্রভুদের তুষ্ট করার মতো কোনো গুণগত পরিবর্তন নয়। কারণ কর্পোরেট পুঁজির (এবং অবশ্যই তাদের সহযোগী আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির) সবুজ বা গেরুয়া কোনো রঙেই আপত্তি নেই। যখন যে রঙ গায়ে মাখলে মুনাফার পারদটা চড় চড় করে ওপরে উঠবে, তখন সেই রঙটাই তারা গায়ে মাখবে। এদের অ্যালার্জি শুধু লাল রঙে। তাই প্রকৃত গুরুদক্ষিণা দিতে হলে পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক মেরুকরণটারই পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর এর জন্য ত্রিপুরা অনুসারী কোনো পরিকল্পনা নয়। পশ্চিমবাংলার জন্য প্রয়োজন 'প্ল্যান-বি'। সহজ কথায় 'প্ল্যান-বি' হলো, 'এ ওর বিকল্প, ও এর বিকল্প' এই প্রচারের সাথে সাথে আরো একটা প্রচার জুড়ে দেওয়া এবং তা হলো, 'বামপন্থীরা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে আজ অপ্রাসঙ্গিক'। কিন্তু গোয়েবেল্‌স্ যাদের পেশাগত 'মেন্টর', তারা জানে শুধু অপ্রাসঙ্গিক বললেই সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবেন কেন? সিঙ্গুর থেকে রাজভবন কৃষকদের বিশাল পদযাত্রা, বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশনের ডাকে রাজ্যের প্রায় আশি হাজার বুথের আশি শতাংশ বুথে শ্রমিক-কৃষকের জাঠা, ৮-৯ জানুয়ারি ৪৮ ঘণ্টার সর্বভারতীয় ধর্মঘটে শ্রমিক-কর্মচারীদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ, চা বাগানে, চটকলে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ লড়াই, ব্যাঙ্ক-বীমা শিল্পে ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে রক্ষা করার জন্য হোয়াইট কলারড্ শ্রমিক কর্মচারীদের লাল ঝাণ্ডা নিয়ে লড়াই, আর্থিক বঞ্চনা, অধিকার হরণ ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে লাল নিশান উড়িয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সর্বোপরি গত ৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড ময়দানে জন সমুদ্রের লাল ঢেউ—এসব তো মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। তাই শুধু বামেরা অপ্রাসঙ্গিক বললেই হবে না। একে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য, আরও কিছু অতিরিক্ত উপাদান প্রয়োজন।

আসলে এই অতিরিক্ত উপাদানটি 'পোস্ট ট্রুথ' প্রচারের জন্য প্রয়োজন। নির্জলা মিথ্যা প্রচার আর 'পোস্ট ট্রুথ' প্রচারের পার্থক্য হলো, পোস্ট ট্রুথ শুধু মিথ্যা বলে না। মিথ্যাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য মানুষের সামনে একটা 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' খাড়া করতে চায়। এমন একটা 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' যাকে মানুষ বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করবে। অবশ্য যুক্তির ফলা দিয়ে 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটিক পর্দাকে সহজেই ছিন্ন-ভিন্ন করা যায়। কিন্তু প্রচার মাধ্যম মুহুর্মুহু প্রচারের অভিঘাতে মানুষের চিন্তা শক্তিকে বিবশ করে দিয়ে যুক্তির জাল বোনার কাজটাই বাধ্যাল করে দিতে চায়। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' তৈরি করা হচ্ছে প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষার নামে। যেখানে দেখানো হচ্ছে বামেরা শূন্য আসন পাবে। সাধারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফলের মাপকাঠিতে একটি রাজনৈতিক দলের শক্তি বিচার করা (সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা খুব অস্বাভাবিকও নয়)। প্রচার মাধ্যম এটা বোঝে বলেই 'বামেরা অপ্রাসঙ্গিক' তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য, প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষার নামে বিভিন্ন সম্ভাব্য ফলাফল দেখাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষার ফলাফলে বেশ কিছু পার্থক্য যেমন থাকছে, তেমনই একটা মিলও থাকছে এবং তা হলো বামেরা হয় শূন্য অথবা একটা-দুটো আসন পাবে, অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল কিন্তু মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করেছিল। তখন কিন্তু তারা বঙ্গীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, এমন কোনো প্রচার করা হয় নি। ঐ সময় ফলাফল বেরনোর পরেও ঐ প্রচার হয় নি, আজ কিন্তু ফলাফল তো দূরের কথা, এমনকি নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে থেকেই প্রচার শুরু হতে দেখা গেছে।

লক্ষ্যটা স্পষ্ট এবং যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ধীরে ধীরে নির্মিত বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার যে দ্বন্দ্বমূলক রাজনৈতিক সমীকরণ (এক কথায় তীব্র শ্রেণী আন্দোলন) তাকে বিপর্যস্ত করা। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 'প্ল্যান-বি', অর্থাৎ রাজ্য রাজনীতিতে বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক এটা প্রতিষ্ঠিত করারও একটা প্রেক্ষিত রয়েছে। আসলে পশ্চিমবাংলায় বাম বিরোধী পরিকল্পনার প্রথম ধাপটি ছিল ২০১১-র পূর্ববর্তী কয়েকটি বছর। এই সময়ে কংগ্রেস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা একটি চরম দক্ষিণপন্থী, নীতিহীন এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গঠিত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে সামনে রেখে, বামফ্রন্ট বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা হয়েছিল। এই সমন্বিত শক্তির মধ্যে কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দলটিও ছিল। কিন্তু সেই সময় তারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল না। আজকের মতো এতগুলো অঙ্গরাজ্যেও তাদের দাপট ছিল না, সর্বোপরি কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির একটা বড় অংশের তখন প্রিয়পাত্র তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রগলভ নন, মৃদুভাষী কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্মকর্তা, অর্থাৎ মজ্জায় নয়া উদারবাদী অর্থনীতির শিক্ষা)। সর্বোপরি রাজ্য রাজনীতিতে তখন রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের হাত ধরে (রাজ্যের বর্তমান শাসকদল ১৯৯৮ সালে তাদের জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদলটির হাত ধরেছে) ঢুকে পড়লেও এবং কলকাতা কর্পোরেশন সহ ইতি-উতি বিভিন্ন পৌরসভা-পঞ্চায়েতে ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভাগ করে খেলেও, আজকের মতো ওঁদের পিছনে কর্পোরেট পুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত প্রচার মাধ্যমের বিপুল সমর্থন ছিল না। ফলে রাজ্য রাজনীতিতে ঠিক জাঁকিয়ে বসার কাজটা তখনও তারা করে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় কর্পোরেট পুঁজি জানতো, বামফ্রন্ট বিরোধী রামধনু জোটের নেতৃত্বে গেরুয়া শিবিরকে আনাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে। মানুষের কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বরং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোনো শক্তিকে বামফ্রন্ট বিরোধী জোটের নেতৃত্বে নিয়ে আসা যাদের কার্যকলাপ, তীব্র বাম-বিদ্বেষ সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল। সেদিক থেকে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলটি ছিল স্বাভাবিক পছন্দ, কারণ কংগ্রেসের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থায় বা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর একের একের পর এক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখে কর্পোরেট ও লগ্নিপুঁজির জোট ভরসা পেয়েছিল। বুঝেছিল, শুধুমাত্র বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ নয়, এ রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে স্বাভাবিক বামমুখী ঝোঁক তাকে ঘেঁটে দেওয়ার জন্য এমনই ক্ষমতায় মদমত্ত উচ্ছৃঙ্খল শক্তির প্রয়োজন।

পাশাপাশি তারা এটাও জানতো, এমন ক্ষমতালোভী ব্যক্তিকেন্দ্রীক, স্বৈরাচারী দল খুব বেশিদিন মানুষের ভরসা ধরে রাখতে পারবে না। কারণ এরা ভাঙার কাজে যতটা দক্ষ, ততটাই অকেজো গড়ার কাজে। আর গড়ার কাজটা একদমই না করতে পারলে সাধারণ মানুষ ভরসা করবেন কেন? শুধু প্রচারে কি চিড়ে ভেজে? ও লগ্নী পুঁজির এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছে, কারণ এ রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্রের শাসক দলকে স্বাভাবিক মিত্র মনে করে। একে অপরকে বিভিন্ন সময়ে মৌখিক শংসাপত্রও দিয়েছে। কেন্দ্রের শাসকদলের ছত্রছায়ায় রাজ্যের শাসকদল দু'দুবার কেন্দ্রীয় ক্ষমতাও ভোগ করেছে। ফলে কর্পোরেট পুঁজির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কার্যত সবরকম সাহায্য করেছে রাজ্যের শাসক দল।

কর্পোরেট পুঁজির গত কয়েক বছরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে আজ। কারণ রাজ্যের শাসকদল সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ ঘটছে দ্রুত। এরাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাম অভিমুখী স্বাভাবিক প্রবণতা অনেকটাই ঘেঁটে গেছে। কেন্দ্রের শাসকদলও প্রচারমাধ্যম ও রাজ্যের শাসক দলের সাহায্য নিয়ে অনেকটাই রাজ্যের বুকে জেঁকে বসেছে। ফলে এখনই সময় নতুন মেরুকরণ তৈরি করার। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন মেরুকরণ তৈরি করার জন্য। যা সফল হলে রাজ্য রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে।

তাই নতুন করে নির্মিত এই ডিসকোর্সটিকে রুখতে হলে, অভিজ্ঞতানির্ভর ডিসকোর্সটিকে আরও বেশি জোরদার করা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রতিনিয়ত পরিচিত বৃত্তে মতের আদান প্রদান। কারণ এবারের লড়াই শুধু নির্বাচনের লড়াই নয়। রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করারও লড়াই। □

২২ এপ্রিল, ২০১৯

ডঃ প্রভাত পট্টনায়ক

ফ্যাসিবাদের ছায়া

মোদী সরকারের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা চাপিয়ে দেওয়া, সমাজের এক অংশের সাথে অপর এক অংশকে বিরোধে জড়িয়ে দেওয়া, ঘৃণার প্রতি এক ধরনের আনুগত্য সৃষ্টি করা এবং এইসব কিছুর আড়ালে রাষ্ট্রের সরাসরি কর্পোরেটের স্বার্থে ভূমিকা পালন।

নাগরিক স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রকাঠামোর পুনর্গঠন, লাগাতার ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রভৃতির ভিত্তিতে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকাল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার সাথে তুলনীয়। কিন্তু সাদৃশ্য এটুকুই। বাস্তবে এই দুই পর্বের মধ্যে মৌলিক বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য হত্যা ও লুঠপাট জরুরী অবস্থার সময় ছিল না। সেই সময় একমাত্র রাষ্ট্রই দমন-পীড়ন চালাতো, কিন্তু এখন রয়েছে 'হিন্দুত্ববাদী' গুণ্ডাবাহিনী, যারা সরকারের সমালোচকদের, তাঁদের 'অপরাধ'-র জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে, এমনকি এই সমালোচকদের মাথার ওপর গ্রেপ্তারীর খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়। আমরা সহজে ভুলতে পারি না সেই অস্বাস্থ্যকর দৃশ্য, যেখানে একজন অধ্যাপককে সরকারের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য হাঁটুমুড়ে ক্ষমতা চাইতে বাধ্য করা হয়।

এক নতুন জাতীয়তাবাদ

দ্বিতীয়ত, যা জরুরী অবস্থার সময় ছিল না, বর্তমান দমন-পীড়নের মাধ্যমে এক মতাদর্শকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার নাম 'জাতীয়তাবাদ', যাকে 'হিন্দুত্ববাদ'-র সমার্থক বলা হচ্ছে, কিন্তু সুযোগসন্ধানীর মতো ভারতের উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের গৌরব ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে কোনোই মিল নেই। ফলস্বরূপ ইন্দিরা গান্ধীর যাঁরা সমালোচক ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সমাজের চোখে সম্মানীয় (যদিও ইন্দিরা গান্ধী তা চান নি), কিন্তু বর্তমান শাসনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন তাঁদের ভাবমূর্তিকে জনগণের শত্রু এমন একটা ছবি এঁকে কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই চক্রান্ত আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করে প্রতিবাদীদের গায়ে দুর্নীতি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের বদনাম লাগানোর চেষ্টা করা হয়। লক্ষ্য হল মানুষের মনের জোরটাকেই ভেঙে দেয়া।

তৃতীয় পার্থক্যটি হল সরকার কর্তৃক গণমাধ্যমের দখলদারি। জরুরী অবস্থার সময় সংবাদপত্র নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল। যার ফলে পাতার বিভিন্ন অংশ ফাঁকা রেখেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হত এবং এর জন্য সংবাদপত্র কিন্তু জনগণের শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছিল। এখন সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এবং এই ব্যতিক্রমও কতদিন থাকবে বলা যায় না, সংবাদ মাধ্যম কার্যত পুরোটাই হিন্দুত্ববাদীদের শিবিরে যোগ দিয়েছে এবং বিরোধীদের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করার কাজটা সহজ হচ্ছে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করেই।

সংবাদ মাধ্যমের পরিবর্তিত ভূমিকাই সেই সময় ও বর্তমান সময়ের চতুর্থ পার্থক্যের অন্যতম উপাদান। মোদী সরকার পুরোপুরি কর্পোরেট স্বার্থের প্রতি নিবেদিত, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর শাসন কর্পোরেটদের সাথে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখত এমনকি কর্পোরেট বিরোধী প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ধরে রাখার চেষ্টা করত। একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে আর কোনও সরকারেরই মোদী সরকারের মতন এত কর্পোরেট প্রেম ছিল না। যার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণকরার জন্য তিনি গুজরাট থেকে দিল্লী আদানির বিমানে চড়ে গেছিলেন (এই প্রসঙ্গে বিপরীতধর্মী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জওহরলাল নেহরু, যিনি হিন্দুত্ববাদীদের ঘোরতর না পসন্দ, অর্থের অভাবের কারণে সুইৎজারল্যান্ডের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যক্ষায় আক্রান্ত তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরুকে দেখতে যেতে পারছিলেন না। এই সময় জি ডি বিড়লা তাঁকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দিলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং নিজেই বিভিন্ন সূত্র থেকে টাকা যোগার করেছিলেন)।

সংখ্যালঘু বিরোধী

পঞ্চম পার্থক্য হল, মোদী সরকারের সংখ্যালঘু, বিশেষত অসহায় মুসলমান সংখ্যালঘু বিরোধী অবস্থান। ইন্দিরা গান্ধীর দমন পীড়নের কোন সুনির্দিষ্ট জাতিগত, ধর্মীয় বা জাতপাত ভিত্তিক লক্ষ্য ছিল না। তাঁর দামন পীড়নের লক্ষ্য ছিল স্পষ্টতই তাঁর এবং বিভিন্ন ধরনের বদমাইসির জন্য কুখ্যাত তাঁর পুত্র সঞ্জয়ের বিরোধীরা। পাশাপাশি ইতিহাস পুনর্লিখনের জন্য কোন জমকালো প্রকল্পও ছিল না, যে ইতিহাসের মূল সুর হবে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিন্দা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যে ইতিহাসকে স্কুল পড়ুয়াদেরও গিলতে বাধ্য করা হচ্ছে, যাতে তাদের চেতনায় একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা যায়।

ষষ্ঠ পার্থক্যটি এই প্রকল্পের সাথেই সম্পর্কিত। যা হল, অপযুক্তিকে জনপ্রিয় করা, যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেয়া, এমন কি বিতর্কের ভিত্তি হিসেবেও প্রামাণ্য তথ্যকে অবজ্ঞা করা। এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখন তা সরকারী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এমনকি এখন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না।

সপ্তম পার্থক্যটি হল মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণের উদ্যোগ এবং বিশেষ করে যা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার পোষিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতন। সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনলে, এগুলির উৎকর্ষতা মার খাবে, কারণ উৎকর্ষতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন প্রশ্ন করার সুযোগ সমন্বিত পঠন পদ্ধতি। কিন্তু যদি তারা এই ধরনের পঠন-পদ্ধতি ধরে রাখতে চায়, তাহলে তাদের সরকারী সাহায্য বন্ধ হবে এবং জাতীয়তাবাদ বিরোধী ভাবনার প্রসার ঘটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হবে। ঠিক যা ঘটেছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। বাস্তব হল, জে এন ইউ, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, পুণের ফিল্ম এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, টাটা ইনস্টিটিউ, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স ও টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এর মতন কয়েকটি দারুণ উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানের যে অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা দেখেই বর্তমান সময়টাকে বোঝা যায়। এই পরিস্থিতি অতীতে কখনও সৃষ্টি হয়নি। অতীতে কোন সরকারই যুক্তিবাদের প্রতি এত অবজ্ঞা প্রকাশ করেনি।

দমন-পীড়ন

জরুরী অবস্থার সময়কাল ও মোদী সরকারের সময়কালের মধ্যে পার্থক্যগুলি মোটাদাগে যেভাবে বলা যেতে পারে, তা হল জরুরী অবস্থা ছিল সমাজ ও জনগণের ওপর রাষ্ট্র দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, যা ছিল স্বৈর শাসনের এক চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত রূপ। এটি নিঃসন্দেহেই ছিল পুঁজিবাদী উন্নয়নের যুক্তি ও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু এটি সরাসরি কর্পোরেট শাসনের প্রতিনিধিত্ব করত না। কিন্তু মোদী সরকারের শাসনকালে শুধুমাত্র চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসন পদ্ধতি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, পাশাপাশি সমাজের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া এবং এক ধরনের ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে। এই সব কিছুর আড়ালে সরাসরি কর্পোরেট স্বার্থে কাজ করা হচ্ছে। এক কথায় এই পার্থক্য হল স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে পার্থক্য। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে দমন-পীড়ন, যেমন কত মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, জরুরী অবস্থার সময়কাল এগিয়ে থাকবে। কিন্তু দমন পীড়নের যে শক্তিকে এখন গড়ে তোলা হচ্ছে তা অনেক বেশী ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী।

মোদী শাসনকালের উল্লিখিত প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য। উন্মত্ত জনতা, কর্পোরেট শক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির সংমিশ্রন (বেনিতো মুসোলিনীর সংজ্ঞায় ফ্যাসিবাদ), অসহায় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করা, অপযুক্তির প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করা প্রভৃতি। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে ১৯৩০ র দশক আবার ফিরে আসবে। আমাদের দেশে ফ্যাসিস্ট শক্তি ক্ষমতায় বসেছে, কিন্তু এখনও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। এবং যেহেতু আজকের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা, তাই ১৯৩০-র দশকের চেহারায় ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার সম্ভাবনাও কম।

তবে এটাও ঠিক ১৯৩০-র দশকের মতই, বর্তমান সময়ের ফ্যাসিবাদী প্রবণতাও, যা শুধুমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট নয়, বিশ্ব বৈশিষ্ট, পুঁজিবাদী সঙ্কট থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে। এমন এক সংকট যা কর্পোরেট ও লগ্নী পুঁজির একচেটিয়া যৌথ শাসনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। তাই এখন তারা এক চেটিয়া শাসনকে বজায় রাখার জন্য এমন এক বিকল্প অবলম্বনের খোঁজ করে, যা মানুষের ক্ষোভের অভিমুখকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতার দিক থেকে ঘুরিয়ে, অন্য কোন এক অংশের দিক থেকে বিপদ আসছে এমন প্রচার করে, সেদিকে নিয়ে যাবে। সাধারণভাবে অসহায় সংখ্যালঘুদেরই মানুষের ক্ষোভের নিশানা বানানো হয়। এই পরিস্থিতে কর্পোরেট পুঁজি কিছু আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর খোঁজ করে (সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষণকারী এমন গোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া বর্তমান সময়ে দুষ্কর নয়) এবং বিপুল অর্থব্যয় করে ঐ গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। বিখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্যালেস্কির কথা অনুযায়ী, "বৃহৎ পুঁজির সাথে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব"। ভারতের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ব অর্থনীতি ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দার কবলে পড়ার ফলে, নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদ যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা অতি দ্রুত যখন অপসৃত হচ্ছে, সেই সময়ে বৃহৎ পুঁজি ও হিন্দুত্ববাদী শিবিরের মধ্যে গাঁট ছড়া বাঁধার কাজটা মোদী করছেন, এটাই তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব।

যদিও ১৯৩০-র দশকের সাথে বর্তমান সময়ের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা হল, সেই সময় পুঁজিবাদী দেশগুলির কর্পোরেট ও লগ্নী পুঁজির যুথবদ্ধতা ছিল দেশভিত্তিক। এবং দেশভিত্তিক এই জোট অপরদেশের সমচরিত্রের জোটের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমরবাদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে যুদ্ধ ডেকে আনে। এর দ্বি-বিধ ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমত, যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বিপুল বৃদ্ধি পায়, যার প্রধান উৎস ছিল সরকারী ঋণ। এই প্রক্রিয়া ফ্যাসিবাদী দেশগুলিকে মহামন্দা বিশেষত বিপুল বেরোজগারীর সমস্যা থেকে বের করে আনে (প্রথম সফল হয় জাপান ১৯৩১ সালে, তারপর জার্মানি ১৯৩৩-এ)। স্বভাবতই মহামন্দা থেকে বেড়িয়ে আসার পর্ব এবং যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মধ্যে একটা স্বল্প সময়ের ফাঁক ছিল, যে সময়টায় বে-রোজগারীর সমস্যা সমাধান করে ফেলার জন্য ফ্যাসিবাদী সরকারগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদ যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলেছিল। যদিও বহু মূল্যের বিনিময়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু যেভাবেই হোক ফ্যাসিবাদ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

কিন্তু আজকের দিনে পরস্পর বিবাদমান এমন কোন কর্পোরেট-লগ্নীপুঁজি গোষ্ঠী আমরা খুঁজে পাব না। এখন তারা সকলেই একটি সুসংহত বিশ্বায়িত কাঠামোর মধ্যে যুক্ত, যে কাঠামো চায় না বিশ্ব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কয়েকটি পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভাগ হয়ে যাক। বরং এমন একটা বিশ্ব চায় যা পুঁজির জন্য, বিশেষত লগ্নী পুঁজির চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অবশ্য তার মানে যুদ্ধ একেবারেই চায় না, তা কিন্তু নয়। কিন্তু আজকের যুদ্ধ হল সেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে যারা বিশ্বায়িত লগ্নী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে নেই অথবা তার নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

যেহেতু লগ্নীপুঁজির আর্থিক ঘাটতি অপছন্দ (এবং যেহেতু লগ্নীপুঁজির আজ্ঞা যেকোন রাষ্ট্রকে মানতে হবে না হলে লগ্নী পুঁজি সেই দেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে বিপুল আর্থিক সংকট ডেকে আনবে), তাই প্রতিরক্ষা সহ যেকোন খাতেই খরচ বৃদ্ধি করে আর্থিক ঘাটতি ডেকে আনা যাবে না। এমন কি পুঁজিপতিদের ওপর কর চাপালেও লগ্নীপুঁজি তার বিরোধিতা করবে। অথচ সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে, এ ব্যতীত কোন রাস্তাও নেই (কারণ শ্রমজীবীদের ওপর কর চাপিয়ে মোট চাহিদা বৃদ্ধি করা যায় না, কারণ তারা তাদের আয়ের প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলে)। সমসাময়িক ফ্যাসিবাদ তাই নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের পরিচালনায় কর্ম সংস্থান চিত্রের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। আবার কর্পোরেটের আর্থিক সাহায্যে প্রতিপালিত হয় বলে, নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জও জানাতে পারে না।

এর অর্থ হল, আজকের ফ্যাসিবাদ শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারনের বস্তুগত উপাদানগুলির উন্নয়ন ঘটিয়ে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয় না। এমন কি পূর্বের পর্বের ন্যায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজেকে ধ্বংসও করে না। সংসদীয় নির্বাচনকেও আজকের ফ্যাসিবাদ এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই বিশ্বায়িত লগ্নীপুঁজি দেশে দেশে মূল্যবান বৈধতা লাভ করে (একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বর্তমান সময়ে লাতিন আমেরিকায় নয়া উদারবাদী নীতিসমূহ থেকে সাহসের সাথে বেড়িয়ে আসা প্রগতিশীল সরকারগুলির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ আমরা দেখছি, তা সবই সংসদীয় বিদ্রোহ, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার নামে যে বিদ্রোহের ডাক দেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্রোহগুলি চরিত্রগত দিক থেকে অতীতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা পোষিত বিদ্রোহ, যা ইরানের মোসাদেঘ বা গুয়েতামালার আরবেনজ্ বা চিলির আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তার থেকে আলাদা)।

এই প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত অন্তিম দৃশ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ, জীবন-জীবিকার মূল বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে ব্যবহার করে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার (সন্ত্রাসবাদ এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা ফ্যাসিবাদী শক্তির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে একে অপরকে শক্তিশালী করার কাজটা করে) প্রভৃতি সত্ত্বেও মোদী সরকার আগামী লোকসভা নির্বাচনে হারতে পারে। কিন্তু পরিবর্তে যে সরকার আসবে, তারা যদি কৃষক ও অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে নয়া উদারবাদী পথ থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারে, তাহলেই কিছু দিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারাবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ করে দেবে।

সমাজের ফ্যাসিকরণ

ফলে আমরা দেখব ফ্যাসিবাদী শক্তি ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় আসছে এবং কখনই শেষ না হয়ে, ঘুরে-ফিরে ক্ষমতায় আসার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে সমাজ ও রাজনীতির ফ্যাসিকরণ সম্পন্ন করছে। উদারহণ হিসেবে আমরা মধ্যপ্রদেশের দিকে দেখতে পারি, যেখানে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসার পর পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারকে অনুকরণ করে 'হিন্দুত্ববাদ'কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ক্ষমতায় আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে সমাজের ফ্যাসিকরণ সম্পন্ন হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সময়ের সাথে সাথে আমরা ফ্যাসিবাদী শক্তির চাপে, সমাজের ফ্যাসিকরণ দেখতে পাব যেখানে ফ্যাসিবাদী শক্তি ক্ষমতায় থাকুক অথবা না থাকু, ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। এটি হল এমন একটি বৈশিষ্ট, যেখানে সমাজের ওপর ১৯৩০-র দশকের কায়দায় কোন চিরায়ত ধর্মী ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা না চাপিয়েও, ফ্যাসিকরণের কাজ চলবে। এ হবে এক ধরনের স্থায়ী ফ্যাসিবাদ, যদি না যে সংকটকাল ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে, তাকে দূরীভূত করা যায়।

এই সংকটকালের কারণ নয়া উদারবাদের সংকট। ভারতে ফ্যাসিকরণের কার্যকরী বিরোধিতা করতে হলে, যা প্রয়োজন তা হল, মৃতপ্রায় এবং যা সারা পৃথিবীকে সংকটে জড়িয়েছে, এমন কি যা থেকে স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পও সংরক্ষণ নীতি চালু করা ব্যতীত আর কোন বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না (সংরক্ষণ নীতি কিন্তু কিছুটা হলেও নয়া উদারবাদ বিরোধী), সেই নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের বাইরে গিয়ে ভাবা। উদারবাদের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিৎ এমন একটি কার্যকরী কর্মসূচী যা শ্রমজীবীদের জীবনমানের দ্রুত উন্নতি সাধন করবে।

একথা বলার মানে এটা নয় যে, আগামী নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদীদের পরাজিত করা এবং সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা প্রথম পদক্ষেপ হলেও সমাজ ও রাজনীতিকে ফ্যাসিকরণ থেকে মুক্ত করার কাজটা অনেকবেশি কঠিন। এর জন্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে এমন এক কর্মসূচী দরকার যা সাধারণ মানুষকে নয়া উদারবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করবে। এই ধরনের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই (এবং ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা) একমাত্র মোদী যুগের ফ্যাসিবাদী উত্তরাধিকার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। □

অনুবাদঃ সুমিত ভট্টাচার্য
[সৌজন্যেঃ ফ্রন্টলাইন, ১২ এপ্রিল, ২০১৯]

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

সাত দফায় অনুষ্ঠেয় সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ হলো তিনটি রাজ্য যেখানে সাত দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১৯ মে পর্যন্ত দেশব্যাপী ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে। ২৩ মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

নানান কারণে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য নির্বাচনগুলির ন্যায় এবারেও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে ঠিকই, কিন্তু শুধু এই বিষয়গুলির মধ্যেই নির্বাচনের তাৎপর্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই নির্বাচনের সাথে শুধু নতুন সরকার গঠনের প্রশ্নটিই যুক্ত নয়, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা সংসদীয় গণতন্ত্র স্বাধীন বিদেশনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই নির্বাচনের ওপর। সুতরাং সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেণ মধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই নিরিখে আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে শ্রমিক, শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

(১)

রাজ্যে বসবাসকারী একজন মানুষ হিসেবে আমাদের তিনটি পরিচিত রয়েছে। একটি পরিচিত হলো—(ক) আমরা ভারতীয় নাগরিক। ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলি ভারতীয় নাগরিকদেরও প্রভাবিত করে চলেছে। তাই ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। (খ) জাতীয় পরিস্থিতির পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া রাজ্য পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করে। বিশেষত বিগত প্রায় আট বছর ধরে চলে আসা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনে রাজ্যে জীবন, জীবিকা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এর জন্য রাজ্যের জনগণ ধর্মঘট সহ বড় বড় ধরনের সংগ্রাম সংগঠিত করছে। আগামী নির্বাচনী সংগ্রামকেও এই সংগ্রামের অংশ করতে হবে। (গ) পেশাগতভাবে আমরা সকলেই কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত বোর্ড কর্পোরেশনের শ্রমিক কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী নিজেদের চাকরিগত সমস্যা বিশেষত বকেয়া মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ, অনিয়মিত বা চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সমস্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে নির্বাচনের ফলাফলের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ এই তিনটি পরিচিতিগত অবস্থান থেকে লোকসভা নির্বাচনকে দেখতে হবে এবং নির্দিষ্ট করতে হবে আমাদের ইতিকর্তব্য।

নির্বাচনের সামনে জাতীয় পরিস্থিতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কী? সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতদাতা মনে করে যে, কর্মসংস্থানের সমস্যাই হলো প্রধান। এই মতামত যে একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। কারণ পাঁচ বছর পূর্বে নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ক্ষমতায় এলে বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দশ কোটি বেকারের চাকরি হওয়া দূরের কথা, বিমুদ্রাকরণ, অপরিকল্পিতভাবে জি এস টি চালু করা প্রভৃতির মধ্য দিয় বিগত দু'বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের চাকরি চলে গেছে। এন এস এস ও-র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেকারীর হার দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ যা বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। আর একটি পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগতভাবে বলে চলেছে যে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাকি রেকর্ডহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যার পরিমাণ প্রায় ৮ শতাংশ। কিন্তু এর সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারের কোনো সম্পর্ক নেই। বিগত শতাব্দীর সত্তর বা আশির দশকে যখন আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার ছিল তিন থেকে চার শতাংশের মধ্যে, তখন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় দুই শতাংশ। কিন্তু বর্তমান আর্থিক বৃদ্ধির হার যখন সাত থেকে আট শতাংশ, তখন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মাত্র ০.১ শতাংশ। একেই বলা হয়ে থাকে 'কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি' বা 'জবলেস গ্রোথ'।

কর্মসংস্থানহীনতাই শুধু নয়, বি জে পির প্রতিশ্রুতি ছিল কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা হবে। ইউ পি এ সরকারের আমলে প্রকাশিত কৃষি কমিশন (যা স্বামীনাথন কমিশন বলে পরিচিত)-এর সুপারিশ কার্যকর করা হবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি আর কার্যকর হয়নি। শেষপর্যন্ত কয়েকটি রাজ্যে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের চাপে এবং মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপির পরাজয়ের পর আংশিকভাবে হলেও স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ লাগু করা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ে তুলবেন। এই লক্ষ্যে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট (যা খোলা বাজারে চালু থাকা মুদ্রার ৮০ শতাংশের বেশি) বাতিল করা দেওয়া হয়। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ নাসিক থেকে মুম্বই দ্বিতীয় লং-মার্চ

বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে বাতিল নোটের ৯৯ শতাংশের বেশি সরকারী কোষাগারে জমা পড়েছে। অর্থাৎ কালো টাকা উদ্ধার, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমুদ্রাকরণ কর্মসূচী গৃহীত হলেও বাস্তবে তা ঘোষিত লক্ষ্যের ধারে কাছে পৌঁছোতে পারেনি। বিপ্রতীপে লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে শতাধিক মানুষ জীবন হারিয়েছেন। তাছাড়া বিমুদ্রাকরনের পরিণতিতে ব্যাপক সঙ্কটে পড়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীরা এবং কৃষিজীবী মানুষ। প্রায় এক কোটি মানুষ সব মিলিয়ে কাজ হারিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। ফ্রান্স থেকে শতাধিক রাফায়েল যুদ্ধ বিমান ক্রয়কে কেন্দ্র করে এই দুর্নীতির ঘটনা জনসমক্ষে এসেছে। শুধু তাই নয়, অনিল আম্বানি গোষ্ঠী, যাদের তরকারি কাটার ছুরি তৈরির অভিজ্ঞতা নেই, সমগ্র বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে তাদের বিমান তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। এ এক নজিরবিহীন দুর্নীতির ঘটনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের শাসনকালে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। জনগণের জীবন যাত্রার উপর নেমে এসেছে সীমাহীন আক্রমণ, তেমনই ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) নেতৃত্বে সংঘ পরিবারের দ্বারা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবেই আক্রান্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গো-মাংস ভক্ষণ, লাভ জিহাদ, ঘরওয়াপসি প্রভৃতির নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে প্রথমে ধর্মীয় বিভাজন ঘটিয়ে, পরে রাজনৈতিক মেরুকরণ করে নির্বাচনী ফায়দা তোলাই হলো এর প্রধান উদ্দেশ্য।

সাম্প্রদায়িকতাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যেই আর এস এস অগ্রসর হচ্ছে। আর এ কাজে বিজেপি জোট সরকারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর জন্য দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর এস এস লোকজনদের বসানো হচ্ছে, যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো জ্ঞানগম্যিই নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত ও জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এবং মহিলাদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের শাসনকালে দেশের গণতন্ত্র বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রও বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সংসদের অধিবেশনকালকে হ্রাস করা, রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিল, অর্থবিল আখ্যা দিয়ে রাজ্যসভায় পেশ না করা, সাংসদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত না থাকা, স্ট্যান্ডিং কমিটিকে এড়িয়ে সরাসরি সংসদে বিল পাশ ও অনুমোদন করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংসদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি এবং ধর্মঘটের অধিকার হরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য হলো প্রথমে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকারহীন করো, তারপর সাধারণ মানুষকে অধিকারহীন করে তুলতে সমস্যা হবে না।

নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের শাসনকালে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, জীবন জীবিকা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ যেমন আক্রান্ত, তেমনই আক্রান্ত হয়ে পড়েছে দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ার তাগিদে মার্কিন প্রশাসনের অন্যায় আবদারের কাছে ভারত সরকার ক্রমাগত আত্মসমর্পণ করে চলেছে। মার্কিন প্রশাসনের নির্দেশে ইরান থেকে জ্বালানী তেল আমদানি ক্রমশ হ্রাস করে শেষপর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। ভেনেজুয়েলা থেকে ভারত যাতে জ্বালানী তেল আমদানি না করে তার জন্য ইতোমধ্যেই মার্কিন প্রশাসন ভারত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় ভারতের নাগরিক এই মুহূর্তে যে সব বিষয়ে গভীর উদ্বিগ্ন তা হলো, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব যার ওপর নির্মিত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার বা দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি। বস্তুতপক্ষে এগুলি হলো ভারতীয় সমাজের চারটি স্তম্ভ, যার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আগামী সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে এর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

(২)

আসন্ন সপ্তদশ নির্বাচনে রাজ্য পরিস্থিতির প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের একজন ভোটার হিসেবে এই পরিস্থিতির অবশ্যই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, (১) রাজ্যে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত, (২) জীবন জীবিকা আক্রান্ত, (৩) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই সময়কালে রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে জাল-জুয়াচুরি করে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিভাবক সমিতি, সমবায়, ছাত্র সংসদ থেকে শুরু করে সব ধরনের নির্বাচনেই একই চিত্র জনগণ পরিলক্ষিত করেছে। সর্বশেষ উদাহরণ হলো পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৩৪ শতাংশ আসনে তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। সর্বশেষ পৌর নির্বাচনেও পরিলক্ষিত হয়েছে একই চিত্র। জনগণের বিগত আট বছরের অভিজ্ঞতা হলো এই যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য পুলিশ বাহিনী, রাজ্য প্রশাসন এবং সর্বোপরি বর্তমান শাসকদল রাজ্য সরকারে ক্ষমতাসীন থাকলে রাজ্যে কোনওভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

রাজ্যে বিরোধী দলের কোনও গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নানান জায়গায় দমিয়ে রাখা হচ্ছে। বিরোধীদের সভা করার জন্য কোনো সরকারী হল মঞ্জুর করা হচ্ছে না। প্রথমে হলের অনুমোদন দিয়ে দেবার পরেও কর্মসূচী শুরুর মুহূর্তে সেই অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এখন তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকারের এক সন্দেহাতীত পরিচিতি হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও এই আক্রমণের বৃত্তের বাইরে নয়। তাদের এবং শিক্ষকদের প্রায় ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার পর তিন বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত। কবে এই সুপারিশ প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রীই বলতে পারবেন। এই বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ও বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ এবং অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবি নিয়ে নবান্নে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। বিকেলে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হলেও পরের দিনই তাদের দার্জিলিং ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বদলী করা হয়।

রাজ্যবাসীর জীবন জীবিকাও এইসময় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যের বেকার সমস্যা ভয়াবহ। নতুন কলকারখানা দূরের কথা, চালু বড় বড় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশাল প্রচারের আড়ালে বহু শিল্প সম্মেলন সংগঠিত হলেও তার নিট ফল কার্যত শূন্য। সরকারী দপ্তর বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকলক্ষ পদ শূণ্য পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ পদেই লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। যে সামান্য সংখ্যক পদে নিয়োগ হচ্ছে, তাও চুক্তিপ্রথায় অথবা অবসরপ্রাপ্তদের থেকে নিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারী চাকরি বা শিক্ষক নিয়োগের জন্য যেসব স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এখন তলানিতে এসে পৌঁছেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হচ্ছে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লেনদেনের সাথে শাসক দলের লোকজন যুক্ত। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শাসক দলের ন্যায় রাজ্যের শাসক দল ও সরকার চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। সারদা-নারদা কেলেঙ্কারিতে শাসক দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র প্রভৃতির ন্যায় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যুক্ত। বিজেপির সাথে বোঝাপোড়া থাকায় এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না।

রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও এখন আক্রান্ত। বস্তুতপক্ষে রাজ্যে এখন চলছে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। আবার বিজেপির সাথে রাজ্যের শাসক দলের আপসের ফলে বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে আর এস এসের শাখা ক্রমবর্ধমান। ২০১১ সালে রাজ্যে শাখার সংখ্যা ছিল ৩৫০টি, ২০১৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৮০টি, ২০১৮ সালে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪০০টি। রাজ্যে এখন বিশ্বহিন্দু পরিষদের শাখার সংখ্যা ১৫০০। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকার স্বার্থে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে আসন্ন নির্বাচনে বামপন্থী গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির জয়ী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(৩)

রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত কর্মচারী ও বোর্ড কর্পোরেশনের কর্মচারীদের কাছে আসন্ন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক লোকসভার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা ঠিক হয়; ঠিক যেমন বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা রাজ্য সরকার নির্বাচিত হয়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হল এই যে কেন্দ্রে একটি কর্মচারী বান্ধব সরকার গঠিত হলে তাদের অনেক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের পক্ষে যখন গৃহীত হয়, তার প্রভাব রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীগত শর্তকে ইতিবাচক দিক থেকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন ছিল আইকে গুজরালের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার। এই সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছিল। পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশকে উন্নত করে (সর্বত্র ফিক্সেশন ফর্মুলায় বিশ শতাংশ বুস্টিং-এর পরিবর্তে ৪০ শতাংশ) কার্যকর করা হয়েছিল। এর সুফল রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও পেয়েছিল রাজ্য বেতন কমিশনের মাধ্যমে। একই চিত্র কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য গঠিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প সরকার গঠিত হলে এবং সেই সরকার যদি বামপন্থীদের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সাধারণ মানুষদেরও উপকার হয়। যেমন ২০০৪ সালে কেন্দ্রে গঠিত মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউ পি এ সরকার। এই সরকার বামপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। এর ফলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সরকারকে দিয়ে করানো সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, বেশকিছু জনস্বার্থ মূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। যেমন, ১০০ দিনের কাজ, বনাঞ্চল আইন, গার্হস্থ্য হিংসা নিরোধক আইন, তথ্যের অধিকার, স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কৃষি কমিশন গঠন, মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে সাচার কমিটি গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, বেশকিছু জনবিরোধী বিল আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। যেমন, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত বামপন্থীদের চাপে প্রথম ইউ পি এ সরকার স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, বেশকিছু বিষয়ের প্রয়োগ বন্ধ করতে ইউ পি এ সরকারকে বামপন্থীরা বাধ্য করেছিল। যেমন ভারতীয় পেটেন্ট আইন সংশোধন। সুতরাং সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী সাংসদরা অধিক সংখ্যায় যদি সংসদে উপস্থিত থাকতে পারে তাহলে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া, সমস্যা সংসদে প্রতিফলিত হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শ্রেণী শক্তিসমুহের পারস্পরিক ভারসাম্য শ্রমজীবীদের অনুকূলে পরিবর্তিত হতে পারে। □

নীতি পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হোন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

দেশের জনগণের সামনে পুনরায় নির্ণায়কের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে। দেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের মতো বহু ধর্ম-ভাষা-সম্প্রদায়-জাতের দেশে প্রতিটি মানুষের মূল্যবান মতামত প্রদান নির্ধারণ করতে পারে দেশের ভবিষ্যৎ। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকেই দেশের মানুষের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কালজয়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পূর্বকালে ব্রিটিশ শাসনে বা রাজতন্ত্রের আমলে সাধারণ জনগণের মতামত প্রদানের কোনো অধিকার ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলত শাসকের মর্জিনির্ভর একতরফা হুকুমদারী ব্যবস্থাই ছিল সরকার পরিচালনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিতে দেখা হতো সামাজিক সমস্যা, অর্থনীতি থেকে রাজনীতি, কৃষি থেকে ব্যবসা সবকিছুই। সমাধান আসত সেই পথেই। বশ্যতার তাগিদে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণে বাধ্য হতো। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। এই একমুখী ব্যবস্থায় ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হতে থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম সরকার গড়ার তাগিদেই শুরু হয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া। দিন যত এগিয়েছে ক্রমশ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার ঘটেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার ৭২ বছর পরেও পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়নি সংবিধান প্রদত্ত মানুষের অধিকারগুলি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদাসীন থেকেছে দেশের শাসককুল।

গণতন্ত্রের চর্চায় এ কথা বহুল চর্চিত যে পাঁচ বছর অন্তর একটা নির্বাচনের ফলের উপর দাঁড়িয়ে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার তার শাসনকালে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত রাখতে পারছে সেটাই মূল প্রশ্ন। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে নাগরিক নিরাপত্তা এমনকি দেশ রক্ষা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত ও বিকাশের ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে মূল্যায়ণ করা হয় এক একটা সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আপামর জনগণ নিশ্চয় সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ানে তুল্যমূল্য বিচার করেই তাদের মতদান করবেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৬ বার লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচন সমকালীন সময়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এবারের (২০১৯) নির্বাচন বিশেষভাবে তাৎপর্যবাহী। এবারের নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র দেশের শাসন ক্ষমতায় কোন দল অধিষ্ঠিত হবে তা নির্ণয় নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে দেশের গণতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন বিদেশ নীতি কতটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব সেই প্রশ্নও। অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই, খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা দূরীকরণের সংগ্রাম ইত্যাদি শ্রেণীসংগ্রাম গণসংগ্রামকে বিকশিত করার লক্ষ্যে যে ধারাবাহিক সংগ্রাম ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশের মানুষ করে চলেছেন তারই একটি বিকশিত রূপ রাজনৈতিক সংগ্রাম। সে অর্থে এবারের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকল্প নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে নীতির দ্বারা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা, সর্বোপরি ভারতের সংবিধান এবং তার কাঠামোকে রক্ষা করা সম্ভব। তাই এই সংগ্রাম নতুন ভারত তৈরির সংগ্রাম।

২০১৪ সাল থেকে ধর্মীয় মেরুকরণ ও ধান্দার ধনতন্ত্রের রসায়ন এই দেশের মাটিকে কলুষিত করে চলেছে। নয়া উদারবাদের এক নম্বর এজেন্টকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসনে বসানোর তাগিদে দেশের কর্পোরেটকুল কিভাবে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ তার প্রচারে ব্যয় করেছে তা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় আছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তো রূপায়িত হয়ইনি, বরং বিগত পাঁচ বছরে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নয়া উদারনীতির বহুমাত্রিক আক্রমণ বেপরোয়াভাবে সংগঠিত হয়েছে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের বার্ষিক অধিবেশনের আগে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অক্সফ্যাম' প্রকাশিত তথ্য বলছে, ভারতে মাত্র এক শতাংশ মানুষ ৫১.৫৩ শতাংশ সম্পদের অধিকারী। উল্টোদিকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ৬০ শতাংশ মানুষ দেশের মাত্র ৪.৮ সম্পদের অধিকারী। কর্পোরেট লবি ও শাসকদলের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ঘটেছে ব্যাপক দুর্নীতি, আক্রান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তাই এই নির্বাচনে ঠিক হবে দেশ বাঁচবে? না নীরব মোদী বাঁচবে। কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষিত হবে না, সাধারণ মানুষের স্বার্থ? ৪৫ বছরের বেকারত্বের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে ফেলেছে মোদী সরকার। ১০ জন ভারতীয়র মধ্যে ৪ জনের সারা বছরে কোনো কাজ জোটে না। কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ব্যুরো প্রকাশিত তথ্য বেকারত্বের ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। তথ্য বলছে ৫৮.৩ শতাংশ স্নাতক এবং ৬২.৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ যুব সমাজ কর্মহীন। এ আই সি টি ই প্রকাশিত তথ্য বলছে দেশে প্রতি বছর যে ১৫ লক্ষ ইঞ্জিনীয়ার পাশ করে তার মধ্যে ৬০ শতাংশ কর্মহীন থাকে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত সি এম আই ই রিপোর্ট অনুযায়ী এই সরকারের আমলে ১.৪৩ কোটি মানুষ নতুন করে বেকার হয়েছে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা অনুযায়ী ৯২ শতাংশ মহিলা এবং ৮২ শতাংশ পুরুষের মাসিক আয় দশ হাজার টাকার কম। ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশেরই কাজের প্রকৃতি হলো অস্থায়ী বা চুক্তির ভিত্তিতে।

নারীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে হরিয়ানায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বিক্ষোভ

বেকারি বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই রাজ্যেও ভয়াবহ চিত্র বর্তমান। মুখ্যমন্ত্রী যতই ঘোষণা করুন না কেন রাজ্যে বেকার সংখ্যা চল্লিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু তা প্রকৃত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাজ্য প্রশাসন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল পদ শূন্য। নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই। এস এস সি'র যোগ্যতা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক পদে নিয়োগ না পাওয়ায় অনশনে বসতে হচ্ছে, যা এই রাজ্যে কখনো ঘটেনি। স্থায়ী পদে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তির মাধ্যমে স্বল্প বেতনে নিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্যে বর্তমান সরকারের শাসনে নতুন শিল্প দূরের কথা, চালু কারখানা তোলাবাজির দাপটে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যবাসী বিশেষত এই প্রজন্মের যুবসমাজকে।

অভিজ্ঞতাই বড় শিক্ষক। বিগত পাঁচ বছরে দেশের জনগণ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারছেন কী দুর্দশার মধ্যে তারা বিরাজ করছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি মতো কালো টাকা উদ্ধার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি, ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ সংগ্রহ মূল্য ইত্যাদি কোনো প্রতিশ্রুতিই পালন করা হয়নি। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশের কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট আরও গভীর হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। পেট্রল-ডিজেলের দাম ক্রমবর্ধমান। কমছে সারা দেশের মোট উৎপাদন। কৃষিতে বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হওয়ায় কৃষকদের দূরাবস্থা ক্রমবর্ধমান। ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ আর ৪ বছর শেষে ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.১ শতাংশ। কৃষি ক্ষেত্রের এই গভীর সঙ্কট ছায়া ফেলেছে দেশের কৃষকদের জীবনযন্ত্রণায়। অভাবী বিক্রি বাড়তে থাকায় ঋণভারে সারা দেশের কৃষক আজ এক মহাসঙ্কটের মুখে। তাই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশের অন্নদাতা কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের লড়াই। এই কৃষক সংগ্রামের প্রভাব ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে পড়েছে। কাঁপিয়ে দিয়েছে শাসকদলের ভীত। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমতো ফসলের ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের দেড়গুণ কার্যকর করা হয়নি। এ বছর কেন্দ্রের সরকার ধানের সংগ্রহ মূল্য ধার্য করেছে কুইন্টাল প্রতি ১৭৫০ টাকা। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মতো এই সংগ্রহ মূল্য ধার্য হওয়া উচিত ছিল কুইন্টাল প্রতি ২৩৫০ টাকা। কেরলের রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্যের উপর ৬০০ টাকা ভর্তুকি দিয়ে সংগ্রহমূল্য ধার্য করেছে ২৩৫০ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার মাত্র ২০ টাকা ভর্তুকি দিয়ে সংগ্রহ মূল্য ধার্য করেছে ১৭৭০ টাকা। কেন্দ্রের সরকারের মতো রাজ্য সরকারও তথ্যের কারচুপি করে অন্যান্য সমস্যাগুলির মতো কৃষি সমস্যাকে আড়াল করতে সচেষ্ট। গত সারে সাত বছরে দেড় শতাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছে এই রাজ্যে, যা অতীতে কখনও ঘটেনি। অথচ রাজ্য সরকার থেকে বলা হচ্ছে একজন কৃষকও আত্মহত্যা করেনি। কৃষকদের আয় নাকি তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। কৃষকদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান না করে নির্বাচনে জেতার জন্য কিছু নগদ টাকার ভিক্ষা ছুঁড়ে দিয়ে কৃষকদের মন জয় করে বাজিমাত করতে চায় দেশ ও রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু বামপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের দাবিগুলি মানুষকে নাড়া দিয়েছে যার নিশ্চিত প্রতিফলন ঘটবে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে।

নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির ধারক-বাহক যে সরকার, সেই সরকারের স্বাভাবিক পরিণতি উগ্র দক্ষিণপন্থা। দক্ষিণপন্থা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, প্রসারিত হচ্ছে, আগ্রাসী রূপ ধারন করছে। নয়া উদারবাদী কাঠামোয় শাসকশ্রেণীর সঙ্কট যত বাড়ছে, তত তাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, সাংবিধানিক কাঠামো, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার, নাগরিক অধিকার এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মতো বিষয়গুলি। বিপন্ন হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষার মৌলিক অধিকার। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে ব্যর্থ সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ভাঙার জন্য নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করছে। কাশ্মীরে জওয়ানদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলাকে ব্যবহার করে ভোটের স্বার্থে উগ্র জাতীয়তাবাদের আবহাওয়া তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য চরম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। উগ্র জাতীয়তাবাদের এই আবহে ওরা হারিয়ে দিতে চায় মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যাকে। যুব জীবনের কাজ না পাওয়ার ব্যথা, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়ায় ক্ষোভ, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী না পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে চায় মেকি দেশপ্রেম আর ধর্মীয় মেরুকরণের উষ্ণতায়।

স্বৈরাচারি, কট্টর বামবিরোধী দক্ষিণপন্থী শক্তি কখনও ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে ও সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে থাকে না, থাকতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গেও নরম সাম্প্রদায়িকতার নামে রাজ্যের শাসক দল ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করে নির্বাচনী ফায়দা তুলতে চায়। সংঘ পরিবারের 'রামনবমী' উদ্‌যাপনের জবাবে রাজ্যের শাসক দল 'রামনবমী' বা 'হনুমানজয়ন্তী' পালন করে দলীয় কর্মসূচী হিসাবে। এই প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মীয় মেরুকরণে প্রবণতা রাজ্যের সম্প্রীতি ও ঐক্য নস্যাৎ করেছে। গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য বামপন্থীরা, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইয়ে সবচেয়ে আগুয়ান। কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যেও শাসকদলের হাতে গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও বিপন্ন। ফ্যাসিবাদী শাসনে যা হয়ে থাকে, পরাধীন দেশ বা ঔপনিবেশিক শাসনে যা হয়ে থাকে তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো রাজ্য সরকার 'ভবিষ্যতের ভূত' প্রদর্শন বন্ধ করে। যেমনটি হয়েছিল জার্মানিতে। বিপ্লব আসতে পারে এই ভয়ে হিটলার 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করেছিল। রাজ্যের মানুষের স্বাধীনভাবে ভাবনার, মতামত দেওয়ার, ন্যায্য দাবি করার অধিকার বিপন্ন। শাসকদলের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো বক্তব্য বা মতামত ব্যক্ত করলেই তাদের রোষানলে পড়তে হয়। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই লড়াকু মানুষ তাদের অধিকার ছিনিয়ে আনবেন—এই বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে।

পাঁচ বছরে দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে দেশ রক্ষার চৌকিদার(!) নিজেই সমস্তরকম নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষার অজুহাতে ফ্রান্সের দাসাউ কোম্পানীর কাছ থেকে রাফাল বিমান ক্রয় করতে গিয়ে দেশের টাকা নয়-ছয় করেছে। বিমান তৈরির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হ্যালকে বাদ দিয়ে সরাসরি অনিল আম্বানির ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে তাকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার উপঢৌকন পাইয়ে দিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সামনে এই তথ্য উঠে এসেছে যে, এই সংক্রান্ত ফাইল প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক যেমনভাবে লোপাট করা হয়েছে সারদা, নারদা কাণ্ডের অর্থনৈতিক কারচুপির তথ্যাবলী। এছাড়াও এই রাজ্যে তোলাবাজি, প্রোমোটারি, সিন্ডিকেট, মেলা, খেলা, উৎসব রাজ কোষাগারকে খালি করে দান-খয়রাতি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। রাজ্যের শাসকদলের সুপ্রিমোর নিকটাত্মীয়া ব্যাঙ্কক থেকে সোনা ও ডলার নিয়ে আসার সময় ধরা পড়া এবং তারপর রহস্যজনকভাবে ছেড়ে দেওয়াতে বিজেপি-তৃণমূলের গোপন বোঝাপরাই প্রকাশ্যে এসেছে। এ রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই দুই শাসকদলের গোপন আঁতাত। উভয় শক্তির চক্রান্তের জাল ছিন্ন করতে তৈরি হচ্ছে মানুষের জোট।

আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামের সাথে এ রাজ্যের জনগণ বিশেষত শ্রমজীবী জনগণের পাশাপাশি শিক্ষক-কর্মচারী সমাজের স্বার্থও জড়িত। রাজ্য প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে চরম অসহিষ্ণুতার বাতাবরণের পাশাপাশি কর্মচারী সমাজের প্রতি চলছে আর্থিক ও অধিকারগত আক্রমণ। বিভিন্ন দপ্তরের কয়েক লক্ষ পদ শূন্য। সামান্য কিছু যা নিয়োজিত হচ্ছে চুক্তিতে বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে। ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া। তিন বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বেতন কমিশন কবে কার্যকরী হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ২০১১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার অধিকারের উপর আঘাত করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক অনুযায়ী এ রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার, আসলে রাজ্য সরকারের অকর্মণ্যতাকেই প্রকাশ করে। অথচ এই ন্যায্য দাবি উত্থাপন করলে সংগঠনের নেতৃবর্গকে দূরদূরান্তে বদলী করা হয়। অথচ এই মুহূর্তে একজন নবীন গ্রুপ সি কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর তুলনায় মহার্ঘভাতা বঞ্চনার পরিমাণ ২৫ লক্ষ ২১ হাজার ৭৮০ টাকা। অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে। এর মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী মানসিকতারই পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু শাসকদলের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী যদি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষের হয়, তাহলে তার প্রভাব কর্মচারীদের উপরেও পড়ে। কেন্দ্রে বামপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট এবং প্রথম ইউ পি এ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে উন্নত বেতন কমিশন কার্যকরী করেছিল। সেই সূত্র ধরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও উন্নত বেতন কাঠামোর অধিকারী হয়েছিল এবং তা কার্যকরও হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসক দলের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তার প্রভাব উভয় অংশের সরকারী কর্মচারীদের উপরে পড়ছে। ফলে এই দুই শ্রমিক কর্মচারী জনবিরোধী ঘৃণ্য অপশক্তিকে পরাস্ত না করতে পারলে জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। কেন্দ্রে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করলে রাজ্যেও শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবাহী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারী হিসাবে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার পাশাপাশি একজন নাগরিক হিসেবে, অভিভাবক হিসেজে জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমরেড অশোক রায়ের জীবনাবসান

পড়াশুনা মল্লারপুর হাইস্কুলে। উচ্চমাধ্যমিক শেষ করেছেন রামপুরহাট কলেজ থেকে। আর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কারিগরী ডিপ্লোমা পেয়েছেন ১৯৮৪ সালে সিউড়ির শ্রী রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ (পলিটেকনিক) থেকে। বোঝাই যায় পশ্চিমবঙ্গের গণ আন্দোলনের শীর্ষ তরঙ্গের সময়কালে এবং বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নতুন ধারার মধ্যেই কমরেড অশোক রায়ের যৌবন বিকশিত হয়েছে। বাবা কুমুদ বন্ধু রায় পেশায় শিক্ষক হলেও দৈনন্দিন জীবনচর্চায় ছিলেন আধুনিক ও সমাজের শিকড় সন্ধানী। ব্যক্তি জীবনের বস্তুগত উপাদানগুলি নিয়ে নতুন ধরনের জীবনবোধ তৈরি করতে নানান ভাবনার সূত্রায়ন ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাবার ভাবনা-চিন্তা, অনুসন্ধানী জীবনচর্চা অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল কমরেড অশোক রায়ের সচেতন চরিত্র নির্মাণে। এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটতে শুরু করে ১৯৮৮ সালের জানুয়ারির শুরুতে পূর্তদপ্তরের অধীন নির্মাণ পর্ষদে চাকরিতে যোগদানের পরপরই। নবমহাকরণ অঞ্চলে একজন কর্মী হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগেনি। গত শতাব্দীর নব্বই এর দশকের শুরুর দিকে তাঁর চাকরিস্থল যখন কলকাতা দক্ষিণাঞ্চলের ভবানী ভবনে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের একনিষ্ঠ কর্মীতে রূপান্তরিত। এই সময় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ও সামাজিক চেতনার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলে উক্ত সমিতির একজন ইউনিট আহ্বায়ক থেকে ক্রমে অঞ্চলের সম্পাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন কমরেড অশোক রায়। সাংগঠনিক প্রশ্নে যোগ্যতা ও নতুন নতুন সৃষ্টিশীল ভাবনা তাঁর কর্মধারাকে প্রসারিত করে কর্মচারী আন্দোলনের মূল স্রোতে। তিনি হয়ে ওঠেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন নির্ভরযোগ্য কর্মী তথা নেতৃত্ব। নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকেই

অসিত ভট্টাচার্য

শ্রেণী-মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সংগ্রাম-আন্দোলনের জীবনচর্চাকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তোলেন কমরেড অশোক রায়।

দক্ষিণাঞ্চলে থাকার সময় নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচী নিতেন তিনি। সংগঠনের প্রতিদিনের নবীন-প্রবীণ কর্মীদের নিয়ে 'সাংগঠনিক আড্ডা' অনুষ্ঠান ছিল এর অন্যতম। 'কেন সংগঠনের কাজ করবো', 'জীবনে কেন এত সমস্যা', 'মহার্ঘভাতা কেন চাইতে হয়'—শীর্ষক আলোচনা দিয়ে শুরু করে তিনি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন সমাজ বিজ্ঞানের শুরুর পাঠ।

পরবর্তীকালে তাঁর কর্মস্থল পুনরায় যখন নব মহাকরণে ফিরে আসে তখন তিনি সমিতি ও অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বের একজন। ফলে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থেকে ক্রমে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হওয়া বা সমিতির কলকাতা বিভাগীয় সংগঠন কমিটির সফল নেতৃত্ব দেওয়ার পরে ক্রমে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক পদে বৃত হওয়া, সংযোগ পত্রিকার লেখক থেকে ক্রমে 'সহ-সভাপতি' হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং পরিশেষে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রধান ধারা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হওয়া, এবং তারও আগে 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার পরিচালনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হওয়া ছিল সময়ের আবর্তনের অনুসারী। যেকোন পদের প্রতি একান্তই নিরাসক্ত কমরেড অশোক রায়ের সাংগঠনিক কাজে পেশাদারী মনোভাবই বিভিন্ন পদকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে এমন একজন সাহসী, সংগঠনের নীতিতে দৃঢ় ও সংগ্রামী যোদ্ধার অভাব বহুদিন অনুভূত হবে।

কমরেড অশোক রায়ের

অসিত রায়

লেখনীর শক্তিতে ধার দেওয়া শুরু 'সংযোগ' থেকেই। মনের অভ্যন্তরে ছোট থেকে সমাজকে দেখার অভিজ্ঞতা, বাবার থেকে পাওয়া বিকল্প জীববোধের শিক্ষার আগুন তো ছিলই, তার সঙ্গে শ্রেণী-যুদ্ধের বিজ্ঞান যুক্ত হওয়ায় তা পরিণতি পেয়েছে নতুন নতুন বিষয়ে 'সংযোগ' ও 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর পাতায় তীক্ষ্ণ, ধারালো ও শ্লেষাত্মক রচনায়। কিন্তু শুধু কর্মচারী আন্দোলনের পত্রপত্রিকাতেই কমরেড অশোক রায় আবদ্ধ থাকেননি। তিনি তাঁর অন্তরের মৌলিক ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম গড়ে তুলেছিলেন প্রকাশ্য ময়দানে। পরিচিত ও জানা ছকের বাইরে গিয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন বিষয়কে প্রকাশ করা ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 'কৌমুদী' ছদ্মনামে পুস্তক প্রকাশ ছিল তার অন্যতম মাধ্যম। নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুরোহিত তন্ত্র তথা ধর্মীয় আচার ও রীতিসমূহ এবং অপসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা ও শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে ২০১০ সালে প্রকাশিত 'মন্ত্রের সংস্কার সংস্কারের মন্ত্র' পুস্তকে। পড়লে বোঝা যায় প্রবল অধ্যয়নের ফলাফল এ বই। বড়সড় বৃত্ত ধরে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের ফলাফলই 'সংযোগ'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রম্যরচনায় শ্লেষাত্মক রচনাশৈলী।

অনেকের যা জানা নেই তা হলো, কমরেড অশোক রায়ের কবি পরিচিতি। খুব সহজ ভাষায়, সহজ

বিজয় শংকর সিংহ

শব্দ প্রয়োগে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারতেন কমরেড রায়। 'কৌমুদি' পরিচয়ে তাঁর ছোট্ট কবিতাগুচ্ছ 'জীবনদা কেমন আছো'-তে তিনি ডাক দিয়েছেন জীবন-যুদ্ধের—

কেমন আছো গো জীবন দা?
চাল, ডাল, তেল, নুন
গনগনে উনুন।
চৈতি হাওয়া, উদাস করা বিকেল
ঘোলাটে চোখ—কেমন বুঝছো?
অন্ধকারের আগল খুলে দিয়ে
বুক চিতিয়ে আজও হাঁক পাড়ি—
জীবন দা ভাল আছ তো,
আমরা সবাই যুদ্ধে আছি।

শুধু সংগঠনের পত্রিকায় বা পুস্তকে নয়, শাসকশ্রেণী ও তাদের নেতৃত্বে চলা বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কমরেড রায় ছিলেন একজন চলমান প্রচারক। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য সহ শাসকশ্রেণীর চরিত্র উন্মোচনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও কর্মচারী বিরোধী যে কোন ঘটনায় তাঁর তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য ফুটে উঠতো সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে। কিছুটা কাকতালীয় হলেও মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে কমরেড অশোক রায়ের একটি শেয়ার করা বক্তব্য আমাদের মতো অনেক ঘনিষ্ঠের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন প্রচারের ঝড় চলছে তখন অশোক রায়ের শেষবারের মতো শেয়ার করা বক্তব্যে দেখা গেছে—

"মরতে তো একদিন হবে....
আসুন না মরার
আগে একবার প্রমাণ করে
যাই যে আমরা
শ্রমজীবীদের আদশেই চলি।"

এত গুণাবলী সত্ত্বেও এটাও সত্যি যে, সাংগঠনিক কাজের ফাঁকে নিজের শরীরের প্রতি তিনি ততটা যত্নবান হতে পারেননি, যতটা প্রয়োজন ছিল। ২০০৯ সালে প্রথম তিনি ভেরিকোস ভেন সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসিত হতে থাকার শেষ দিকে ২০১০ সালে

সুমন কান্তি নাগ

অকস্মাৎ সেপটিসিমিয়ার আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তার সহ সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সে যাত্রা সেরে উঠলেও শেষের দিকে তিনি কিডনি সংক্রান্ত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের সমস্ত বিধিনিষেধ না মেনেই তিনি পারিবারিক ও সাংগঠনিক সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। এমনকি, রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে সাংগঠনিক কারণে সফরও করেছেন তিনি অসুস্থতা নিয়েই। শেষের কয়েকমাস ধরে তাঁকে সপ্তাহে তিনদিন 'ডায়ালিসিস' করতে হয়েছে। মৃত্যুর দিনও তাঁর 'ডায়ালিসিস' নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। এভাবেই এক সম্ভাবনাময় ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সমগ্র সাংগঠনিক জীবনে কমরেড অশোক রায় যে আকঙ্ক্ষা বহন করেছেন—তাকে রূপায়ণের লড়াই-সংগ্রামের মধ্যপথে এবং বলা চলে জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁকে হারিয়ে কর্মচারী আন্দোলন তীব্র মর্মবেদনার পাশাপাশি তাঁর স্বপ্নকে শেষ পর্যন্ত রূপায়িত করার শপথ গ্রহণ করছে।

কমরেড অশোক রায়ের বৃদ্ধ বাবা-মা জীবিত রয়েছে। রয়েছেন তার স্ত্রী ও দুই পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন। এমন অকস্মাৎ বিপর্যয়ে আমরা তাঁদের সকলকে জানাই বেদনাহত হৃদয়ের গভীর অনুভূতি।

কমরেড অশোক রায় চিরকাল জীবিত থাকবেন আমাদের মাঝে।

গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ রাজ্য

অর্পণ রায় (পুত্র)

কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে, কলকাতার কর্মচারীভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে প্রয়াত কমরেড অশোক রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, এস ই এস এ সংগঠনের সভাপতি অসিত রায়, সাধারণ সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ, সংগ্রামী হাতিয়ারের পক্ষে সুমিত ভট্টচার্য, সংযোগ পত্রিকার পক্ষে সনৎ বেরা, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মুখার্জী উভয় সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকগণ যথা স্মরজিৎ রায় চৌধুরী, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ দস্তিদার, অমর সরকার, মানব পাল প্রমুখ। এছাড়াও জেলা /অঞ্চল কমিটি ও বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত সমিতিও শ্রদ্ধা জানায়। শ্রদ্ধা জানান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্পণ রায়।

সভায় শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন অসিত ভট্টাচার্য। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন বিজয় শংকর সিংহ, সুমন কান্তি নাগ ও পুত্র অর্পণ রায়। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য কাউন্সিলের সপ্তম সভা

সদস্য প্রয়াত কমরেড অশোক রায় সহ এই সময়কালে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালন করা হয়।

প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা রাখতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে সময়ে আমরা রাজ্য কাউন্সিল সভায় মিলিত হয়েছি তখন গোটা দেশে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। বিগত ৫ বছর দিল্লীতে যে সরকার চলছে তারা দেশবাসীকে দেওয়া প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে দেশের কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করেছে। বেকারদের কর্মসংস্থান, কৃষকের আয়বৃদ্ধি, বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার সবটাই কথার কথা থেকে গেছে। বর্তমান সরকার মালিকের স্বার্থে শ্রমআইন সংস্কার করেছে, দেশের সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়েছে, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বিলগ্নীকরণ করেছে, সর্বশেষ নোটবন্দীর নামে দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর চরম আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। জাল নোট উদ্ধার ও সন্ত্রাসবাদীদের অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করার লক্ষ্যে নোটবন্দী করা হচ্ছে বলে দাবি করা হলেও দেশের মানুষ দেখেছেন এর কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। উপরন্তু শতাধিক মানুষ এই নোটবন্দীর ফলে প্রাণ হারিয়েছেন। এর সঙ্গে রয়েছে দেশের স্বশাসিত সংস্থাগুলির ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ঘটনা, স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর সরাসরি আক্রমণ। এক কথায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষরা লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে বারে বারে পথে নেমেছেন। দেশজোড়া ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। দেশে কৃষক সমাজ আজ রাজপথে। মহারাষ্ট্রে লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে কৃষকদের লং মার্চ সরকারকে বাধ্য করেছে তাদের দাবিকে কিছুটা হলেও মান্যতা দিতে। দেশের শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক মহাশয়রাও প্রতিবাদপ্রতিরোধে সামিল হয়েছেন এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এমনকি দিল্লীর রাজপথেও। তাই এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য অভিজ্ঞতাকে আমাদের অনুগামীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, আমাদের পরিবারসহ বৃহত্তর পরিসরের মানুষজনকে আগামী বৃহত্তর সংগ্রামে সঠিক দিশার সন্ধান দেওয়া।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ধারাবাহিক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য আসলেও এই সাফল্যে আত্মতৃপ্ত না হয়ে সঠিক সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মসূচীগুলি বিশ্লেষণ করে, এর মধ্যে যে ত্রুটি-ঘাটতিগুলি আছে তাকে অতিক্রম করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির সাংগঠনিক দৈনন্দিন কাজ, কর্মী সংগঠকদের নিজ সমিতির সদস্যভুক্তির কাজে প্রতিনিয়ত যুক্ত থেকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২০১৯ সাফল্য মণ্ডিত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ভুক্তি সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী প্রতিপালনে সমিতি/জেলা/অঞ্চলগুলিকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আসন্ন ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন এ বছর ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। একে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে ব্লক-মহকুমা-জেলা সম্মেলনগুলিকে সফল করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে জুলাই-আগস্ট মাস ব্যাপী সংগঠন-সম্মেলন তহবিল সংগ্রহ অভিযানকে কেন্দ্র করে সকল সদস্য বন্ধুদের কাছে সম্মেলনের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। তহবিলের হারঃ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা এবং তদূর্ধে ২০০ টাকা। ফ্যামিলি পেনশনার্সদের জন্য ৫০ টাকা।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে জেলা/অঞ্চলগুলির পক্ষ থেকে আলোচকরা মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, কাউন্সিল সভায় সামগ্রিক আলোচনায় এটাই নির্ধারিত হচ্ছে যে, বিগত কর্মসূচীর সাফল্যকে ধারণ করে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে 'সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২০১৯' কর্মসূচীতে অংশ নিতে হবে। সকল দপ্তরে স্থায়ী কর্মচারীর পাশাপাশি অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের কাছেও সদস্যভুক্তির আহ্বান নিয়ে যেতে হবে এবং জুন মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আগামী মে দিবসের কর্মসূচীকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিপালন করতে হবে। স্বাধীনতা উত্তরকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম আগামী লোকসভা নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে দেশের জনগণের ওপর। আমাদের দায়িত্ব দ্বিবিধ--- প্রথমত, একদিকে পূর্বের ঐতিহ্য কে অক্ষুণ্ণ রেখে অবাধ, সুষ্ঠ , নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী সরকার গঠনের প্রশ্নে নিজ অভিজ্ঞতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজ মতামত পরিবার ও পরিজনদের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সমগ্র আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলিকে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করেন। সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দাবিতে

নির্বাচন কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা-হীনতা বোধ কাজ করতে শুরু করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে থেকেও একই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদফায় পত্র মারফত নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি বিস্তারিত আলোচনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সময়ও চাওয়া হয়েছিল। যদিও সাক্ষাতের সময় পাওয়া যায়নি। নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে এসেছে, নির্বাচন কর্মীদের মধ্যে শঙ্কা ততই ঘনীভূত হয়েছে। নির্বাচনের দিনগুলিতে প্রতিটি বুথে কর্তব্যরত কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়টিকে ঘিরে ধোঁয়াশাই থেকে গেছে। কোন কোন বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে, তাও পরিষ্কার করে জানানো হয়নি।

এমতাবস্থায় বিভিন্ন জেলায় নির্বাচন কর্মীরা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা স্বার্থে। একই দাবিতে ১৭ এপ্রিল '১৯ বুধবার, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে (যে সমস্ত জেলায় ১৮ এপ্রিল নির্বাচন রয়েছে, সেগুলি বাদে) এবং কলকাতার নবমহাকরণ, কলকাতা কালেকটরেট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, খাদ্য দপ্তর, বেলেঘাটার কর্মাশিয়াল ট্যাক্স দপ্তর ও সল্টলেকের বিকাশভবনে টিফিন বিরতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে বিক্ষোভ দেখান রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। ১১ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নির্বাচন কর্মীদের কাছে সুখকর নয়। তাই সংগঠন দাবি জানাচ্ছে পরবর্তী দফাগুলিতে নির্বাচন কর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনকে করতে হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এই মর্মে এক বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচন কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দ্বিবিধ দায়িত্ব প্রতিপালনে নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত তৎপরতা প্রদর্শন করতে হবে। একই সাথে নির্বাচন কর্মীদের নির্বাচন বিধি অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে। □

এ যন্ত্রণার অবসান চাই

উৎসর্গ মিত্র

“ এক কথায় বলতে গেলে, মোদি জমানায় দেশে বাক্-স্বাধীনতা বলতে প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সরকার যদি মনে করে তার অস্তিত্বের পক্ষে আপনি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন, কিম্বা আপনার কাছে তার দুর্নীতির নানা তথ্য মজুত আছে এবং আপনি সেগুলি দেশের স্বার্থে জনগণের সামনে তুলে ধরতে চান, তাহলে যে কোনোরকমে সরকার আপনাকে ফাঁসিয়ে দেবে”। ২০১৭ সালের ৯ জুন সাংবাদিক সম্মেলনে বসে দেশের প্রাচীনতম সংবাদ চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা প্রণয় রায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল ঠিক এইরকমই। এর দিন চারেক আগে অর্থাৎ জুনের ৫ তারিখে প্রণয় ও তাঁর স্ত্রী রাধিকার বাড়িতে সিবিআই হানা হয়ে গেছে ঐ দু'জনের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে। পরবর্তীকালে সে মামলা আদালতে খারিজ হয়ে যায়। মামলা যে টিকবে না, সে কথা সিবিআই অফিসও জানতো, তবু তারা হানা দিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। আসলে এর আগের দেড় বছর ধরে দেশে বাক্-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল প্রণয়-রাধিকা প্রতিষ্ঠিত এন ডি টি ভি-র চ্যানেলগুলি। সে আন্দোলন ক্রমশ শক্তি পাচ্ছে দেখে সরকার (পক্ষান্তরে বিজেপি) প্রমাদ গুণতে শুরু করে এবং সন্দেহ নেই, তাকে ভাঙার মরিয়া প্রচেষ্টাতেই এই হানার ছক কষা হয়েছিল। ভাবতে লজ্জা করে, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে আজ দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে দেশের মানুষকে লড়াই করতে হয় এবং সে লড়াই ভাঙতে দেশের সরকার চক্রান্ত পর্যন্ত করতে পিছপা হয় না।

অথচ এটাই আজকের চিত্র। যে বছরের ঘটনা এখানে উল্লেখিত হলো, সেই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী অরুণ জেটলি লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে এক বক্তৃতায় খোলাখুলি বলেছিলেন যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরে ‘দেশপ্রেম’-এর স্থান হওয়া উচিত। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে, সরকার যখনই কোনো মতকে ‘দেশপ্রেম বিরোধী’ বা দেশবিরোধী বলে মনে করবে, তখনই তাকে কড়া হাতে দাবিয়ে দিতে পিছপা হবে না এবং এটাই এখনকার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী। জেটলির এই বক্তব্য সে সময়ে বিজেপির অন্দর মহলেও ঝড় তুলে দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে সে ঝড় দলের পরিচালকদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। বিজেপিবিরোধী মনোভাব ও বক্তব্যকে ‘দেশ বিরোধী’ আখ্যা দিয়ে কি সরকারের তরফে, কি তার রাজনৈতিক দলের অনুগামীদের (সঠিক ভাবে বললে গেরুয়া গুণ্ডাদের) তরফে নির্বিচারে চলেছে ডাইনি খোঁজার পালা। প্রাণ দিতে হয়েছে একের পর এক মুক্ত চিন্তার উপাসককে।

ব্যাপারটা এমন নয় যে, বাক্-স্বাধীনতা বা মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এর আগে দেশে ঘটেনি। ইন্দিরা সরকারের সময়ে যখন দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়, তখন নেমে এসেছিল সংবাদপত্রের ওপর এক দানবীয় ‘সেন্সরশিপ’। দেশের কোথাওই সরকারের নিয়োগ করা এজেন্টকে না দেখিয়ে খবর প্রকাশ করা যেত না। এই বাংলাতেও আমরা দেখেছি এমনকি রবীন্দ্রনাথের উক্তিও ছাঁটাইয়ের কবলে পড়েছে। এখনকার পঞ্চায়েত মন্ত্রী তখন রাইটার্সে ছিলেন এর দায়িত্বে। এমনভাবে তিনি কাঁচি চালাতেন তখন সদ্য দায়িত্ব পেয়ে যে, সংবাদপত্রগুলি এক সময়ে এক জোটে প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় ছাঁটাই করা অংশগুলি সাদা রেখে কিম্বা প্রয়োজনে সম্পূর্ণই সাদা খবরের কাগজ প্রকাশ করতে। জরুরী অবস্থা উঠে গেলে সেই সেন্সরশিপও লোপ পেয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী সলোমন রুশদির ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ এ দেশে নিষিদ্ধ করে দেন মুসলিম সমাজের এক অংশকে অনাবশ্যক খুশি করতে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে একাধিকবার মকবুল ফিদা হুসেনের একাধিক সৃষ্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এমনকি এই সেদিনও ২০১২ সালে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের সময়ে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী অসীম ত্রিবেদীকে জেলে পোরা হয়েছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সংবিধান অবমাননার বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কিন্তু ‘দেশদ্রোহিতা’র তকমা দিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যে ধরনের হস্তক্ষেপ এখন চলছে সরকার বা তার অনুগামীদের তরফে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। সরকার তো বটেই, এমনকি তার চ্যালা-চামুন্ডারাও ঠিক করে দিচ্ছে কী বলতে হবে, কী পড়তে হবে, এমনকি কী খেতে হবে পর্যন্ত। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। বিজেপি পরিচালিত আগের সরকারগুলিকেও দেশবাসী দেখেছেন, দেখেছেন তাদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী, কিন্তু ক্রমাবনতি ঘটে চলেছে। এখন বাক্-স্বাধীনতা তো দূরস্থান, দেশে সুস্থ বিতর্কেরও কোনো পরিবেশ আর নেই। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরাই এখন ঠিক করে দিচ্ছেন কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাবে এবং কোন সুরে সেই আলোচনাগুলি করা যাবে। এঁদেরই প্ররোচনায় দেশের এক শ্রেণীর দুষ্কৃতি আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের অপছন্দের কথা বলা নাগরিকদের ওপর, তাদের ওপর দেগে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহিতার ছাপ। মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হচ্ছে দেশপ্রেম, বিজেপি-প্রেম আর হিন্দুত্বকে। ফলে, যে আজ বিজেপি বিরোধী এবং তাদের ধারণা যায় এবং এ মামলা করা হচ্ছে শুধুমাত্র সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেই নয়, করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও। অর্থাৎ সরকার এবং তার দল চাইছে দেশপ্রেমকে শিখণ্ডী করে প্রতিবাদীকে নিয়ে যা খুশি করতে, যেমন ভাবেই হোক না কেন, তার মুখ বন্ধ করে দিতে।

কিছু ক্ষেত্রে বিজেপি-র এই প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল। সংবাদপত্রের একটা অংশ, যাদের পুঁজি কম, অথবা ছোটো সংবাদ চ্যানেল—মূলতঃ তদন্ত-ধর্মী খবরের জন্যেই যেগুলি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল, তারা নিজেরাই সুর নরম করে ফেলেছে শুধুমাত্র টিকে থাকার তাগিদে। এমনকি এদের মধ্যে সংবাদ জগতে ‘বিগ হাউস’ বলে পরিচিত ‘টাইমস গ্রুপ’এর সংবাদ চ্যানেল ‘টাইমস নাও’-ও রয়েছে। প্রতিবাদের যে সুর মোদী জমানার প্রথম দিকে ‘টাইমস নাও’-এ শোনা যেত, তা এখন অনেকটাই নরম হয়ে প্রায় ‘জাতীয়তাবাদী’ হয়ে গিয়েছে। আবার হিন্দি এবং ইংরাজি সংবাদ জগতের এই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার যা শুরু করেছে এখন জনগণের সাথে, তা ফ্যাসিবাদকেও হার মানায়। সূত্র বলছে, শুধু মাত্র ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৭-র এপ্রিল মাসের মধ্যে চুয়ান্ন বার সাংবাদিক পেটানো হয়েছে শুধু নয়, এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ তিনটে খবরের চ্যানেল এবং পঁয়তাল্লিশটা ওয়েব চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানেও শেষ নয়, প্রতিহিংসায় সরকার শুধু এইটুকু সময়ের মধ্যেই পঁয়তাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা এনেছে— খোলা গলায় কথা বলার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তাঁরা এখন আদালতে হত্যে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ওয়ার্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী কম বাক্-স্বাধীনতার দিক থেকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৬তম— ‘আচ্ছে দিন’এর জমানায় ২০১৪-র পরে তার পদস্খলন ঘটেছে তিন ধাপ।

সংবিধানের ৯ নম্বর ধারায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু ‘দেশের স্বার্থে’ সেই অধিকারের যে ‘যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ’-এর কথা ঐ সংবিধানেই বলা আছে, সেটাকেই হাতিয়ার করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এখন তার বিরুদ্ধে সঠিক ভাবে ওঠা নানা বিরুদ্ধ মতের গলা টিপে ধরতে চাইছে। দিল্লীর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকর অশোক মালিকের ভাষায়, ‘‘ভারতে বাক্-স্বাধীনতা থাকলেও এখন সেই স্বাধীনতা দিয়ে সরকারকে আক্রমণের অধিকার মানুষের নেই’’। শুধু অশোকই নন, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে কর্মরত অর্থনীতির অধ্যাপক মৈত্রীশ ঘটক সহ দেশের এক বড়ো অংশের বিশেষজ্ঞের মতে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাক্-স্বাধীনতার অনুযায়ী ‘হিন্দুত্ব’ বিরোধী, সেই-ই আজ ‘দেশ বিরোধী’, সুতরাং তার সাথে নাকি যা খুশি তাই করা যায়—তাকে হুমকি দেওয়া যায়, পেটানো যায় এমনকি খুন পর্যন্ত করে ফেলা যায়—সরকার কোনো ব্যবস্থা নেবে না। এরকম পরিস্থিতি এর আগে দেশে আসেনি কখনো, যেখানে সরকার আর হুলিগানিজম হাত ধরাধরি করে চলেছে। অথচ সেটাই হচ্ছে এখন।

আসলে সরকার চায় দেশের মধ্যে বিরুদ্ধ সমস্ত কণ্ঠকে রোধ করে এমন এক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে, যাতে দেশ চালাতে তাদের সীমাহীন ব্যর্থতাকে মানুষের নজরে আনা সম্ভব না হয়, দেশ বিক্রিতে তাদের ষড়যন্ত্রকে দেশের মানুষের সামনে আনা সম্ভব না হয়। আর এ কারণেই জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এমন ক্ষেত্র --- সংবাদপত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়া—এই দুটোর ওপরেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ চলছে প্রতি নিয়ত সরকার এবং বিজেপির তরফে। বিদেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিং তো নিয়মিতভাবেই এখন সাংবাদিকদের ‘প্রেস্টিটিউট’ বলে অভিহিত করে থাকেন। ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মতো সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে এক শ্রেণীর স্ব-নিয়োজিত জ্যাঠামশাইকে এখন নিয়মিত দেখতে পাওয়া যায়, যাদের কাজই হলো বিভিন্ন পোস্টে ঢুকে গিয়ে নানারকম কুৎসা করা। বিশেষ করে মহিলাদের পোস্টে এদের ভূমিকা হয়ে ওঠে মারাত্মক। গালিগালাজ আর খেউরের বন্যা বইয়ে তাঁদেরকে বাধ্য হয়ে পোস্ট প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা প্রতি নিয়ত চলে এইসব জ্যাঠামশাইদের দ্বারা। একই কাজ চলছে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও এবং সেটা হচ্ছে সরাসরি সরকারেরই দ্বারা, আর এক্ষেত্রে তাদের হাতিয়ার ‘দেশদ্রোহিতা’র মামলা, যে মামলায় সরাসরি হাতে না মেরেও ক্রমাগত হয়রান করা যায়, প্রয়োজনে জেলেও পোরা পরিচিত নাম ‘জি নিউজ’ পুরোপুরি নিজেদের নিয়োজিত করেছে সরকার ভজনায়। এ কাজ করতে গিয়ে তাদের সংবাদ এবং সংবাদ উপস্থাপনার মান নেমে গিয়েছে অনেকটাই, কিন্তু তবু তারা এ কাজে বিরত হয়নি, কারণ তাদের এই স্তাবকতার পুরস্কার তারা পেয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যেই। জি নিউজের মালিক সুভাষচন্দ্র এখন রাজ্য সভায় বিজেপি মনোনীত একজন ‘সম্মানীয়’ সদস্য।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভেরই যদি এমন হাল হয়, সেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে বাধ্য এবং এখন সেটাই ঘটছে। শুধু সরকার নির্বিচারে তার অপকর্ম চালিয়ে যাবার লাইসেন্স পাচ্ছে তাই নয়, সরকারী দলের দুর্বৃত্তরাও সমাজে তাদের ‘রাজ’ কায়েমের কর্মসূচী চালিয়ে যেতে পারছে বিনা বাধায়। সংবাদপত্র বা চ্যানেলগুলি চুপ থাকায় সমাজে গেরুয়া দৌরাত্ম এখন প্রায় তালিবানি অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সমাজে মানুষ কি খাবে, কি পরবে, কি উৎসব পালন করবে বা কি কথা বলবে, তা ঠিক করে দিচ্ছে হিন্দুত্বের ঐ দুর্বৃত্তরাই। এদের থামানো দরকার, কিন্তু প্রশ্ন হলো ‘‘কি ভাবে?’’ শুধুমাত্র গরুকে কেন্দ্র করেই যেভাবে নিরীহ মুসলিম নিধন শুরু হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ তৈরি করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তার বিরুদ্ধে জনমত তো গড়ে তোলার দরকার! কিভাবে হবে সেটা? ২০১৭-র জুন মাসে মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর থেকে পনের জন মুসলিমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’র অভিযোগে। তাদের অপরাধ, তারা নাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটে পাকিস্তানের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। ঐ বছরেই রাজস্থানে পহেলু খান বলে একজনকে গেরুয়া গুণ্ডারা পিটিয়ে মারল গরু পাচারের অভিযোগে, পরে প্রমাণিত হয়েছিল ‘পাচার’ নয়, ভদ্রলোক তাঁর গরুগুলিকে হরিয়ানায় এক পশু-মেলায় নিয়ে গিয়ে ফের ফিরে আসছিলেন তাঁর নিজেরই গ্রামে। এর আগে ২০১৫ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে দাদরিতে আখলাখ খান বলে এক পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোককে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল ফ্রিজে গোমাংস রাখার অভিযোগে, অথচ ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে সেটি আদৌ গোমাংস ছিল না, ছিল সাধারণ খাসির মাংস। সম্প্রতি পুণেতে মহসিন খান বলে এক তরুণ কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারকে পিটিয়ে মারা হলো ফেসবুকে শিবাজী বিরোধী পোস্ট করার অপরাধে, যার সাথে সে একেবারেই জড়িত ছিল না! এই সবগুলিই নাকি ‘দেশদ্রোহমূলক’ অপরাধ, সবগুলিই ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে, সবগুলিই প্রশংসা পেয়েছে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের কাছ থেকে এবং ঐ সমস্ত রাজ্যের পুলিশই এখনও সবগুলির অপরাধীরই কোনো খোঁজ পায়নি! শুধু মুসলিমরাই নন, বিজেপি বা গেরুয়া গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কলম ধরা হিন্দুরাও রেহাই পাচ্ছেন না এদের হাত থেকে। মাল্লেশাপ্পা কালবুর্গী, গৌরী লঙ্কেশ, গোবিন্দ পানসারে বা কিছুদিন আগের নরেন্দ্র দাভোলকর এর অনেকগুলি দুঃখজনক উদাহরণের মধ্যে সামান্য কয়েকটা।

সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীন ভাবে চলতে দিলে এইসব ঘটনার যোগফলে ইতোমধ্যেই যে জনমত গড়ে ওঠার কথা, তার বিস্ফোরণে মোদী সরকারের পরমাণুতে পৌঁছে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা হয়, কারণ গত পাঁচ বছরে সে সরকার এমন কিছুই করেনি জনগণের জন্যে, যার জন্যে জনগণ দুহাত ভরে বছরের পর বছর তাকে আশীর্বাদ দিয়ে যাবে। বরং গত পাঁচ বছরে দু'হাত ভরে কামিয়ে নিয়েছে আম্বানি-আদানির মতো মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পগোষ্ঠী এবং অবশ্যই সরকারের একেবারে ওপর তলার মন্ত্রীদের পুত্র-কন্যারা আর জনগণ পেয়েছে বক্তৃতার নামে প্রধানমন্ত্রীর নাটক আর নাটক! সুতরাং এবার ভোটে মোদী সরকারের কুলোর বাতাস ছাড়া আরা কিছু প্রাপ্য হতে পারে না জনগণের কাছ থেকে। সরকার বা বিজেপি এটা ভালো মতোই জানে, আর জানে বলেই যাবতীয় উপায়ে স্বাধীন মত প্রকাশের কণ্ঠরোধ করতে মরিয়া তারা।

আশার কথা হচ্ছে এত কিছু করেও সচেতন মানুষের কণ্ঠকে রোধ করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বা সন্ত্রস্ত করতে সরকারের হাতিয়ার ‘ইনফরমেশন টেকনোলজি এক্ট’এর ৬৬(ক) ধারাকে বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সেখানে অন্তত স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর কোনো বাধা আর এখন আইনত নেই। দারুণ অপছন্দ হলেও এখানে সরকার বিরোধী মত প্রকাশের জন্যে বা জনমত তৈরির চেষ্টার জন্যে কাউকেই আর গ্রেপ্তার করতে পারছে না সরকার। সংবাদ মাধ্যমের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের মধ্যেও তাই সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে চলেছে দারুণভাবে জনমত তৈরির কাজ। মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিচ্ছেন এতে। এগিয়ে আসছে সুশীল সমাজ, তৈরি হচ্ছে জনমত। বিধান সভার নির্বাচনগুলিতে একের পর এক পতন ঘটছে বিজেপি দুর্গের। এবার জনগণের সামনে দিল্লী... শেষ দুর্গ ভারতীয় জনতা পার্টির। সেটাকেও ভাঙার আবেদন করেছেন সারা দেশের চারশো বিজ্ঞানী, মুম্বাইয়ের তিনশো প্রযোজক আর ছয়শো অভিনেতা-পরিচালক। গোটা দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে ভোট দেওয়ার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন রেখেছেন তাঁরা এবং আবেদন রেখেছেন সঙ্গী-সাথীসহ বিজেপিকে বিদায় করার জন্যেই ভোট দিতে। আমাদের রাজ্যেও চারশোর ওপর গুণীজন একই আবেদন মানুষের কাছে রেখেছেন। আগামী ২৩ মে জানা যাবে সে আবেদনে মানুষ সাড়া দিয়েছেন কতটা, কিন্তু সাড়া দেওয়া যে উচিত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই আর আজ এই মুহূর্তে নেই। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 11th Issue, March 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

নতুন গ্রাহকবর্ষের আহ্বান

সব্বার হাতে যাক সংগ্রামী হাতিয়ার

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার আবার একটি নতুন গ্রাহক বর্ষ শুরু হবার মুখে। আগামী মে মাস থেকে ৪৮তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে আমাদের প্রিয় পত্রিকা, যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্র, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সংগঠনের একটি মুখপত্রের এই দীর্ঘকাল ধরে পথ চলা নিশ্চিতভাবেই গর্বের বিষয়। এই গর্বের শরিক শুধু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নয়, এমনকি কেবল অনুগামীরাও নয়, এই গর্বের শরিক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ। যাঁরা আমাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, বা সেই অর্থে অনুগামীও নয়, তাঁরাও অনেকেই পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক, সমালোচক এবং উৎসাহদাতাও বটে। অনেকেই আছেন যাঁরা গ্রাহক না হয়েও পত্রিকার নিয়মিত বা অনিয়মিত পাঠক। তাঁরা সকলেই পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই দীর্ঘ পথ চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত সবসময়ে প্রসারিত করেছেন রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সাথীবৃন্দ। বর্তমানে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থাকা ত্রিপুরার রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতা কখনও ভোলা যাবে না। এই সমস্ত অংশের গ্রাহক, পাঠকদের নিয়েই সংগ্রামী হাতিয়ার-র বিশাল পরিবার। সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার নতুন গ্রাহকবর্ষের প্রাক্কালে প্রথমেই সকলকে রক্তিম অভিবাদন জানাই পত্রিকার পক্ষ থেকে।

সংগ্রামী হাতিয়ার জন্মলগ্ন থেকেই নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অগ্রসর হয়েছে। সত্তরের দশকের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ জন্মলগ্নেই সামলাতে হয়েছে পত্রিকাকে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নব্বই-এর দশকের শুরুতে বিশ্ব রাজনৈতিক ভারসাম্যের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী উদার অর্থনীতির আগমন। এই সময় একদিকে মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে উদার অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নেমে আসা আক্রমণের চ্যালেঞ্জ, এই দ্বিবিধ চ্যালেঞ্জকে মাথা উঁচু করে মোকাবিলা করেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রহিন্দুত্ববাদী শক্তির দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির জাতীয় রাজনীতিতে নতুন শক্তি নিয়ে আগমন সারা ভারতে শ্রমজীবীদের সামনে এক নতুন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য বিভাজনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হাতিয়ার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। বর্তমানে সেই বিপদ আরও ঘনীভূত, সারা দেশ এমনকি অভূতপূর্বভাবে এই রাজ্যেও— তখনও সংগ্রামী হাতিয়ার অবিচল তার সংগ্রামে। ধর্মকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে দেবার সব ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হাতিয়ার বরাবর মুখর। বর্তমানেও তার কোনো ব্যতিক্রম হবার নয়, হয়ও নি।

২০১১ সালে রাজ্যে পটপরিবর্তনের পর থেকে রাজ্য কর্মচারীদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চলেছে। সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনা গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেবার প্রচেষ্টা, হয়রানী মূলক বদলী—এই সবধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করে চলেছে। সংগ্রামী হাতিয়ার সেই আন্দোলন সংগ্রামের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ যেমন করেছে, আবার শাসকের কদর্য চেহারা, তার রাজনীতি কর্মচারীদের কাছে উন্মোচন করার ক্ষেত্রেও সচেষ্ট থেকেছে। কারণ শাসকের শ্রেণী রাজনীতি উপলব্ধি না করতে পারলে লড়াই সংগ্রামের সঠিক কৌশল স্থির করা যায় না, সংগ্রামে জয়ী হওয়াও যায় না।

আজকের দিনে যখন দক্ষিণপন্থী কোনো নেতা বা নেত্রী বামপন্থার মুখোশ পরে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন অথবা চরম দক্ষিণপন্থী কোনো শাসক ধর্মকে রাজনীতির ময়দানে নিয়ে এসে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন তখন সংগ্রামী হাতিয়ার-এর দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ২০১১ সাল থেকে সেই বর্ধিত দায়িত্ব পালনেই নিষ্ঠাবান থেকেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তা আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত আট বছর ধরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সীমাহীন আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন। আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে যখন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম জারি রয়েছে, তখন সংগঠনের নেতা কর্মীদের ওপর নেমে এসেছে আক্রমণ। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিরোধী স্বৈরাচারী রূপ কর্মচারীদের সামনে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে সচেষ্ট থেকেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। আবার শুধু শাসকের স্বরূপ প্রকাশ করেই পত্রিকার কাজ সমাপ্ত হয়নি, শাসকের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করার কাজটিও করেছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সেই ধরনের ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠন, যারা অনুগামীদের শুধু নিজস্ব দাবি দাওয়ার আন্দোলনে সীমাবদ্ধ রাখাটা সঠিক বলে মনে করে না। সংগঠন সঠিকভাবেই বিশ্বাস করে সরকারী কর্মচারী সমাজ বা সমাজের কোনো একটি অংশ 'সব পেয়েছির দেশে' থাকবে আর বাকি অংশটা তীব্র শোষণের মধ্যে থাকবে এটা কখনও হতে পারে না। যদি হয়ও তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। তাই সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার দেশের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংবাদ বা বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। যাতে কোন্ প্রেক্ষাপটে কর্মচারী আন্দোলন রয়েছে তার একটা সামগ্রিক ধারণা কর্মচারী মননে প্রবেশ করে।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। ১১ এপ্রিল থেকে ১৯ মে ২০১৯ পর্যন্ত সাত দফায় এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে। ২৩ মে '১৯ ফল ঘোষণা হবে, তারপর নতুন সরকার গঠিত হবে। অত্যন্ত প্রতিকূল অথচ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় সময়ের সন্ধিক্ষণে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রে চরম দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তির নেতৃত্বে যে জোট সরকার বিগত পাঁচ বছর ধরে সাধারণ মানুষের উপর নানা ধরনের আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, সংখ্যাগুরু ধর্মীয় মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তকে প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছে, ভারতের সংবিধানকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখিয়েছে, সেই সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় পুনরায় আবির্ভূত হবে, নাকি কেন্দ্রে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ

একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে—এর উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দেশবাসী।

এইরকম পরিস্থিতিতে সংগ্রামী হাতিয়ার শুধু কর্মচারী সংগঠনের মুখপত্র বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। অতীতেও যখন যখন দেশ এবং রাজ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি এসেছে তখনও পত্রিকা চুপ থাকেনি। কেন চুপ থাকবে? আর এস এস-বি জে পি একটি মহাকাব্যের নায়ক চরিত্র রামকে রাজনীতির হাতিয়ার করে ঐতিহাসিক চরিত্র বানিয়ে, তার 'জন্ম স্থানে' মন্দির নির্মাণ করতে চায়। মন্দির নির্মাণ গৌন, আসল উদ্দেশ্য ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিভাজন ঘটানো। এর আঁচ কর্মচারী আন্দোলনে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এমনটা সংগ্রামী হাতিয়ার মনে করে না। তাই চুপ করে বসে থাকবে না আমাদের পত্রিকা। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে একই কৌশল অবলম্বন করছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। এতে শুধু সংখ্যাগুরু মৌলবাদ পুষ্ট হচ্ছে না, সংখ্যালঘু মৌলবাদও সার, জল পাচ্ছে। এদের আসল উদ্দেশ্য আরও গভীরে। শাসক দল বিজেপি তীব্রভাবে নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। যার প্রভাবে বিগত পাঁচ বছরে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা, আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান্দার ধনতন্ত্র বিকশিত হওয়ার পরিণামে দুর্নীতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সারা দেশজুড়ে এই আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ মূলত এই নীতির বিরুদ্ধেই দেশজুড়ে ২০ কোটি মানুষ ধর্মঘট করেছেন। আন্দোলন যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তখন শাসকের হাতিয়ার হয় বিভাজনের রাজনীতি। সেই উদ্দেশ্যেই রাম-৩৭০ ধারা-অভিন্ন দেওয়ানী বিধি এই প্রসঙ্গগুলিকে সামনে আনছে শাসকশ্রেণী।

এইরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে সংগ্রামী হাতিয়ার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। নির্বাচনে কর্মচারী ও তার পরিবার পরিজনকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয়। তাই পরিস্থিতি সম্পর্কে আর পাঁচজন মানুষের মতো কর্মচারীদেরও সচেতন থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা বরাবরই পরিস্থিতি সচেতন। কিন্তু আজকে বাস্তব পরিস্থিতিকে গুলিয়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছে। বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যমের পরিবেশিত সংবাদ ও তথ্য কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের বড় অংশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের সংবাদ মাধ্যম মালিকদের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী বিকৃত, বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে। তাই এই মুহূর্তে সংগ্রামী হাতিয়ারের দায়িত্ব বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সংগ্রামী হাতিয়ার দায়বদ্ধ কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের প্রতি। এই দায় থেকেই সচেতনতা প্রসারের কাজটা এই সময় আরও গুরুত্ব দিয়ে করে চলেছে পত্রিকা।

আগামী ২৬ মে '১৯ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চতুর্থবারের জন্য বর্ধিত মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। রাজ্য সরকার এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে তার আগে পে-কমিশনের রিপোর্ট পেশ হতে পারে। কাজেই ২৬ মে '১৯-এর পর আরও জোরদার সংগ্রামে শামিল হবে সংগঠন। এই লোকসভা নির্বাচনের সাথে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই এটা ঠিক। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ইতিবাচক ফলাফলের উপর রাজ্যের স্বৈর শাসনের আসন টলমল হওয়া নির্ভর করছে পরোক্ষে। এই রাজ্যেই তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর আর এস এস-এর বিভিন্ন শাখা সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে রাজ্যের শাসক দল প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করেছে, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছে অথবা দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা বামফ্রন্ট আমলে কখনো ঘটেনি। শাসন প্রক্রিয়ার দিক থেকেও এই সরকার স্বৈরাচারী, ঠিক কেন্দ্রের সরকারের মতোই। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসক দল একে অপরের উপর যতই যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখান, মানুষ এটা বুঝতে পারছেন যে কেন্দ্রের শাসকের হাত রাজ্যের শাসকের মাথায় আছে। মানুষ দেখছেন সারদা, নারদ কাণ্ডে অপরাধীরা বহাল তবিয়তে আছে কারণ, সিবিআই সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না। আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই বোঝাপড়া পরিষ্কার। এইসব বিষয় পত্রিকার পাতায় তুলে ধরা হচ্ছে দৃঢ়তার সাথে। তাই কেন্দ্রে শাসকের পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাবে রাজ্যের স্বৈরশাসকের আসন টলমল করবে। রাজ্যের কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষের সামনে ইতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এই পরিষ্কার বার্তা পৌঁছে দিতে চায় সংগ্রামী হাতিয়ার।

মে ২০১৯ থেকে আরেকটি নতুন বছরে পা দেবে সংগ্রামী হাতিয়ার। নির্বাচন পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যাবে সংগ্রামী হাতিয়ার। ১৯টি জেলা ও ৭টি অঞ্চল সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বের সহযোগিতা ছাড়া সংগ্রামী হাতিয়ার চলতে পারতো না। পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী, ম্যানেজারিয়াল টিম সততার সাথে দায়িত্ব প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবার চেষ্টা করেছে। কুরিয়ারের মাধ্যমে জেলাতে দ্রুত পত্রিকা প্রেরণের প্রচেষ্টা রয়েছে। জেলাগুলিও সাধ্যমতো দ্রুততার সাথে মহকুমা, ব্লকের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী। তবে সর্বস্তরেই কিছু ঘাটতি দুর্বলতা রয়েছে যা কাটাতেই হবে।

প্রচারের নতুন উপাদান হিসেবে সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রতিটি সংখ্যার পিডিএফ ফাইল জেলা/অঞ্চল সম্পাদকের পোস্ট করে দেওয়া হচ্ছে। জেলাগত ও অঞ্চলগত হোয়াট্স্ অ্যাপ গ্রুপ করে জেলা ও অঞ্চলের খবর ও ছবি সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সকল উদ্যোগ বিগত বছরে পত্রিকার সামগ্রিক কর্ম প্রক্রিয়ায় এবং পত্রিকার প্রচারে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সঠিক দিশা দেখায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার সহ অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির মুখপত্রগুলি। এখনও বেশ কিছু সদস্য আছেন যাঁদের কাছে পত্রিকার গ্রাহক ভুক্তির আহ্বান নিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। এখনও কিছু নিয়মিত পাঠক আছেন যাঁদের গ্রাহকভুক্তি করা যায়নি। নতুন গ্রাহকবর্ষে আমাদের চ্যালেঞ্জ হোক এদের সবার কাছে গ্রাহকভুক্তির আহবান নিয়ে পৌঁছোনো। পুরাতন গ্রাহকদের নতুন বছরে গ্রাহকভুক্তি নিশ্চিত করতেই হবে। পত্রিকার প্রকাশনা খরচ বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, নিয়োগও বন্ধ। গ্রাহকের চাঁদা ছাড়া আমাদের আর কোনো আয়ের উৎস নেই। সুতরাং পত্রিকার গুণগত মান বজায় রেখে ধারাবাহিক প্রকাশনা চালাতে গেলে গ্রাহকভুক্তির প্রাপ্ত অর্থই আমাদের সম্বল। তাই পত্রিকার গ্রাহকভুক্তির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করা প্রয়োজন, যাতে একজন অনুগামীও বাদ না যান। আর প্রশ্ন যদি আসে, কেন গ্রাহক হব? তার উত্তর নিশ্চয়ই আমাদের কর্মীরা দিতে পারবেন। এই পত্রিকা ও সহধর্মী আরও কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া কর্মচারীদের স্বার্থে কথা আর কেউ বলে না। কর্মচারীদের উপর সব ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগ্রামী হাতিয়ার। আমরা যদি দৃঢ়তার সাথে এই আহ্বান নিয়ে অনুগামীদের কাছে পৌঁছোতে পারি তাহলে গ্রাহকভুক্তি বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়। তাই 'আমরা পারবই' এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই নতুন বছরে গ্রাহকভুক্তি অভিযানে আসুন আমরা সকলে শামিল হই। □

মানস কুমার বড়ুয়া

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।